অমর্ত্য সেনের বক্তব্য অনৈতিহাসিক

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অমর্ত্য সেন গত ২৩ জুলাই ইংরেজি দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সিঙ্গুরে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে টাটাকে দেওয়া এবং শহরের কাছে উর্বর কৃষিজমিতে শিল্প স্থাপনের পক্ষে মতামত দিয়েছেন। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত মতামত দেশের গণতান্ত্রিক মানুষ মেনে নিতে পারেননি। নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে শিল্পের নামে কৃষিজমি দখল করতে গিয়ে চাষীদের ওপর চূড়ান্ত বর্বর ও স্বৈরাচারী অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চালানোর ফলে সি পি এম যখন ঘরে বাইরে সর্বত্র ধিক্কৃত এবং কোণঠাসা, সেই মুহূর্তে অমর্ত্য সেনের মতো খ্যাতিমান ব্যক্তির দেওয়া এই সার্টিফিকেট সি পি এম সোল্লাসে লুফে নিয়েছে এবং পরদিনই গণশক্তিতে তা ছবি সহ পুনর্মুদ্রিত করেছে। দেশে বহু কিছু ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও সেসব সম্পর্কে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে অমর্ত্য সেনকে কোনও উদ্বেগ প্রকাশ করতে শোনা যায়নি । যখন গোটা দেশের বুদ্ধিজীবীরা নন্দীগ্রাম গণহত্যার নিন্দা করেন, এমনকী সরকারি নীতির সমর্থক বুদ্ধিজীবীরাও এই ঘটনাকে 'পুলিশের বাড়াবাড়ি' বলে মন্তব্য না করে পারেননি তখনও অমর্ত্য সেন কিন্তু নীরবই ছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যখন রাজ্য সরকার এবং সিপিএমকে জনগণ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে, তখন অমর্ত্য সেন মুখ খুলেছেন এবং তার বক্তব্যে শাসকদল উল্লসিত। তৎসত্ত্বেও আমরা মনে করি তাঁর বক্তব্য অবশ্যই বিচার করে দেখা উচিত। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বলেই কারও মতামত প্রশ্নাতীত হয়ে যায় না। আবার একথাও ঠিক, নোবেল পুরস্কারের সামাজিক স্বীকৃতির কথা মাথায় রেখে একজন নোবেল-প্রাপ্ত খ্যাতিমান মানুষ যা বলবেন, তা গভীরভাবে বিচার করে, ইতিহাস ও তথ্যের বিকৃতি না ঘটিয়েই তাঁর বলা উচিত। আমরাও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও ইতিহাসের নিরিখেই বিচার করে দেখার চেষ্টা করব যে, তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা কতখানি এবং কেন সিপিএম তাঁর বক্তব্য প্রচার করতে এত আগ্রহী।

অমর্ত্য সেন বলেছেন— ইতিহাস থেকে তিনি দেখেছেন শিল্প শহরের কাছেই গড়ে ওঠে। এজন্যই ম্যাঞ্চেস্টার, বার্লিন, প্যারিস, সেন্ট পিটাসবার্গের কাছেই শিল্প গড়ে উঠেছে। এদেশেও ৩০০ বছর আগে জব চার্নক গঙ্গাতীরে শহুরে আবাস দেখেই কলকাতা শহরের পত্তন করেন। পলাশির যুদ্ধের পর হুগলি নদীর দু'ধারে

উর্বর কৃষিজমিতেই শিল্প গড়ে উঠেছিল। সুদূর অতীতের দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বলেছেন — ফা হিয়ানের ভারতবৃত্তান্তে দেখা যায়, 'কলকাতার কাছেই', বলতে গেলে 'বৃহত্তর কলকাতারই অংশ' তাম্রলিপ্ত থেকে তিনি সমুদ্র যাত্রার জন্য নৌকা ধরেছিলেন। তিনি রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি ও টলেমিরও উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, সেযুগেও 'কলকাতার কাছেই' তাম্রলিপ্ততে শিল্প হয়েছিল। অতীতের এই দৃষ্টান্তগুলির নিরিখে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, সে যুগে তমলুকে যদি শিল্প হয়ে থাকে তবে বর্তমানে সিঙ্গুরে তা হতেই পারে। এই যুক্তির ভিত্তিতে তিনি আরও বলেছেন, আজ সিঙ্গুরে শিল্পস্থাপনের বিরোধিতা করা মানে হল ২০০০ বছরের ইতিহাসেরই বিরোধিতা করা। দেখা যাক, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে এই সব যুক্তির সারবত্তা কতটা।

সর্বপ্রথম একথা বলতে আমরা বাধ্য যে, ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা তাঁর খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আধুনিক বিজ্ঞান দেখিয়েছে, বিশ্বজগৎ, মানবসমাজ ও তার ইতিহাস সদা পরিবর্তনশীল। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতির নতুন মাপকাঠিগুলি বাদ দিয়ে নিছক অতীতের মাপকাঠিগুলির পাশাপাশি রেখে বর্তমানের বিচার করা অবৈজ্ঞানিক ও সেই কারণে ভ্রান্ত। অথচ সেই কাজটাই করেছেন অমর্ত্য সেন। অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লবের নিরিখে তিনি বর্তমানের 'শিল্পায়নের' জিগিরকে ব্যাখ্যা করেছেন। ইতিহাস ও অর্থনীতির অআকখ জ্ঞান যাঁর আছে তিনিই বুঝবেন, অষ্টাদশ শতকের অবাধ প্রতিযোগিতার যুগে উদীয়মান পুঁজিবাদ যা করতে পেরেছে, আজ চূড়ান্ত বাজার সংকটে জর্জরিত, একচেটিয়া কর্পোরেট শাসিত যুদ্ধবাজ পুঁজিবাদের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। সেদিন শিল্পায়নের ফলে গড়ে উঠেছিল ম্যাঞ্চেস্টার-ল্যাঙ্কাশায়ারের মতো নতুন নতুন শহর। নগরায়নের ইতিহাস আলোচনা করার সময় এ প্রসঙ্গে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করব। কিন্তু যেসব প্রশ্নের জবাব অমর্ত্য সেন মহাশয়কে দিতে হবে, তা হল, শিল্প গড়ে ওঠার আগে ম্যাঞ্চেস্টার বা ল্যাঙ্কাশায়ার কি আদৌ শহর ছিল? এই সব জায়গায় কি আগে শহর ছিল এবং পরে শহরের কাছে শিল্প গড়ে উঠেছে, নাকি শিল্প হয়েছে বলেই এই সব জায়গাগুলি শহরে পরিণত হয়েছে। ফা হিয়েনের উল্লেখের দ্বারাও সিঙ্গুরের জমি দখল যুক্তিসঙ্গত প্রমাণিত হয় না। ফা হিয়েন গঙ্গাপথে পাটলিপুত্র (আজকের পাটনা) থেকে তাম্রলিপ্ত এসে সিংহল যাওয়ার নৌযান ধরেছিলেন। কলকাতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। কাজেই ফা হিয়ানের সাক্ষ্যে তাম্রলিপ্তকে 'কলকাতার কাছে' আখ্যা দেওয়া একেবারেই অমর্ত্যবাবুর নিজ মস্তিষ্কপ্রসূত তথ্য — ইতিহাস

নয়। প্রসঙ্গত এ প্রশ্নও আসবে যে, ফা হিয়ান এসেছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে পঞ্চম শতাব্দীর একেবারে গোড়ায়, অর্থাৎ ১৬০০ বছর আগে। সে যুগে রাস্তাঘাট যানবাহন যে স্তরে ছিল, তাতে তাম্রলিপ্তকে কি কোনভাবেই 'কলকাতার কাছেই' বা 'বৃহত্তর কলকাতারই অন্তর্ভুক্ত ছিল' বলা যায়? কলকাতা শহরের বয়সই মাত্র ৩০০ বছর, ১৬০০ বছর আগে কলকাতা কেমন ছিল তারও ইতিহাস সুস্পষ্ট নয়। তমলুক ছিল সওদাগরদের জলপথে যাতায়াতের বন্দর। শিল্প বলতে সে যুগে আধুনিক যন্ত্রশিল্প নয়, কুটির ও হস্তচালিত শিল্প, কারুশিল্প ইত্যাদিকেই বোঝাতো — একথা অমর্ত্যবাবুর না জানার কথা নয়। পূর্বাঞ্চল থেকে সওদাগররা প্রধানত নুন, চিনি, হস্তচালিত তাঁতে তৈরি কাপড় ইত্যাদি যে নিয়ে যেত, তার প্রমাণ যে কোনও পাঠক প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত রমেশ চন্দ্র মজুমদারের দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল বইতে পাবেন। সে যুগে ক্ষুদ্র হস্তশিল্পের জন্য বিস্তীর্ণ কৃষিজমি দখল ও ব্যাপক কৃষিজীবী মানুষকে উচ্ছেদের প্রশ্ন আসেনি। কাজেই নন্দীগ্রামে 'শিল্পায়নে'র সঙ্গে তাম্রলিপ্তের 'শিল্পে'র তুলনা অচল। অমর্ত্য সেন মনে করেন — টাটার কারখানায় যাঁরা কাজ করবেন তাঁরা শহরের কাছেই থাকতে চাইবেন। এটাই স্বাভাবিক। এই যুক্তিতে কর্মচারী আবাসনের জন্য হাজার হাজার কৃষককে উচ্ছেদ করা অন্যায় থাকে না। দুঃখের হলেও এমন যুক্তিই তুলেছেন অমর্ত্য সেন, যা অমানবিকতার পক্ষে ওকালতি ছাড়া কিছু নয়।

বস্তুত, শিল্প ও শহরের পারস্পরিক সম্পর্ককে টাটার স্বার্থে এবং সিপিএমের অন্যায়ের সমর্থনে উপস্থাপনা করতে গেলে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। দুনিয়ার বুকে শত শত বছর ধরে শহরগুলি গড়ে ওঠার ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলেই আমরা দেখতে পাব, ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক প্রয়োজন থেকে সেগুলি গড়ে উঠেছে। সেগুলি থেকে যে সাধারণ সত্যে আমরা পৌঁছতে পারি, তা হল — কৃষি, হস্তশিল্প, সওদাগরি বাণিজ্য, প্রশাসনিক বা সামরিক প্রয়োজন, বা আধুনিক যন্ত্রশিল্প — দেশভেদে-যুগভেদে এইসব প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে যেখানে বহু মানুষ একত্রিত হয়েছে, সেখানেই ধীরে ধীরে বাজার এবং শহর গড়ে উঠেছে। আমাদের উপমহাদেশে, প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে পণ্য উৎপাদনের ঊষালগ্নেই প্রধানত কৃষিপণ্যের উৎপাদন এবং বিনিময়কে ভিত্তি করে উত্তর পশ্চিমে সিন্ধুনদ এবং বর্তমান আফগানিস্তানের হেলমন্দ নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সিন্ধুসভ্যতার নগরগুলি। আবার পরবর্তীকালে মধ্যপ্রাচ্যের আরব মরুভূমির বুকে

সওদাগরদের যাতায়াতের পথে বিশ্রামস্থল হিসাবে গড়ে উঠেছিল মক্কার মতো শহর। নগরায়ন প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ রামশরণ শর্মা লিখেছেন, শহর গড়ে ওঠার অপরিহার্য শর্ত হল বাজার। মধ্যযুগে যখন শোষণমূলক রাষ্ট্রের বিভাগগুলি আদিম রাষ্ট্রের তুলনায় সম্প্রসারিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রকাঠামো আরও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে, তখন প্রশাসনিক এবং সামরিক প্রয়োজনে মূলত দুর্গরক্ষিত কিছু শহর তৈরি হয়েছিল, যেমন সেন্ট পিটার্সবার্গ। সামন্ততন্ত্রের অবসান ও শিল্পবিপ্লবের যুগে যন্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে নতুন শিল্প-শহরগুলি গড়ে ওঠে। এই সময় পুরনো শহরের মধ্যে কিছু যেমন গুরুত্ব হারায়, আবার কিছু শহরের মর্যাদা ও গুরুত্ববৃদ্ধি ঘটে। শিল্পবিপ্লবের সময় নতুন শিল্পকে কেন্দ্র করেই ম্যাঞ্চেস্টার, ল্যাঙ্কাশায়ারের মতো শহরগুলি গড়ে ওঠে। অর্থাৎ এইসব শহরগুলি আগে থেকেই ছিল, শহুরে সুযোগ সুবিধা দেখে শিল্পপতিরা এইসব শহরের কাছাকাছি পুঁজি খাটাতে চেয়েছিল— অর্মত্য সেনের এই বক্তব্যকে ইতিহাস সমর্থন করে না। অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত কার্টার ও পিয়ার্সের প্রামাণ্য গ্রন্থ, এ হিস্ট্রি অব ইংল্যান্ড-এ দ্য, নিউ টাউন শীর্ষক পৃথক অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ''... new urban population grew up in the industrial districts which were themselves the product of new machines'' (পৃষ্ঠা ৬৭২) অর্থাৎ শিল্পসমৃদ্ধ জেলাগুলিতে নতুন করে শহুরে মানুষ বেড়ে গিয়েছিল, যে জেলাগুলি গড়ে উঠেছিল যন্ত্রশিল্পের ওপর ভিত্তি করে। এই সময়ই, ১৮০১ সালে লন্ডন ও ব্রিস্টলের পর তৃতীয় স্থানে থাকা নরউইচের স্থান তিন থেকে দশে নেমে যায়। বার্মিংহাম, গ্ল্যাসগো, ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুল, লীডস, ব্রাডফোর্ড, শেফিল্ড প্রভৃতি নতুন শহর গড়ে ওঠে শিল্পকে ভিত্তি করে। মূলত শ্রমিক ব্যারাক দিয়ে শুরু হওয়া এই শহরগুলি গড়ে উঠেছিল অপরিকল্পিতভাবে। সেযুগেও কৃষিজমি দখলকে সুনজরে দেখা হয়নি। ১৮০৬ সালে হাউস অব কমন্সের সদস্য উইলবারফোর্স বলেছিলেন, স্কটল্যান্ড ও সাউথ ওয়েলসে অনুর্বর বন্ধ্যা জমিতে শিল্প গড়া হয়েছে, অথচ লন্ডনে সবুজ ধ্বংস করা হচ্ছে। সে যুগে জনবসতির ঘনত্ব অনেক কম ছিল, পরিবেশ দূষণ গুরুতর সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়নি। জমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর নতুন জীবিকার উপায় করা আজকের মতো অসম্ভব ছিল না। তৎসত্ত্বেও সে সময়ে পুঁজিবাদী উন্নয়নের জনবিরোধী চরিত্রের সমালোচনা হয়েছিল। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের প্রগতিশীল ও সৃজনশীল ভূমিকা মেনে নিয়েই পুঁজিবাদী শিল্পায়নের প্রক্রিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনকে দুর্দশার দিকে ঠেলে দেওয়ার তীব্র নিন্দা করা হয়েছিল। সে যুগে বুর্জোয়া যন্ত্রশিল্প চাষীর জীবনকে

কীভাবে তছনছ করেছিল, তার মর্মস্পর্শী বিবরণ মার্কস দিয়েছেন ক্যাপিটালের ২৮ অধ্যায়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে ভারতে যে শিল্পবিস্তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্রিটিশই ঘটাচ্ছিল তার জনবিরোধী চরিত্র উদ্‌ঘাটিত করে মার্কস বলেছিলেন, ''বুর্জোয়ারা এর চেয়ে ভাল কিছু — কবে, কোথায় করেছে!''

বুর্জোয়া শিল্পায়নের স্বার্থে যখন জবরদস্তি কৃষক উচ্ছেদ করে, কৃষকদের বিক্ষোভ পাশবিক শক্তিতে দমন করে আধুনিক শিল্পশহরগুলি গড়ে তোলা হয়েছিল, তখন শ্রমিক চাষীর গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি অর্জিত হয়নি, গণতন্ত্র অটুট রাখার জন্য সংগ্রামের সংগঠিত শক্তি গড়ে ওঠেনি — সে যুগে কী কী অত্যাচার মানতে সাধারণ মানুষ বাধ্য হয়েছিল তার নজির দেখিয়ে আজ তা মানতে বাধ্য করার কথা বলার মানে হল বর্বর বুর্জোয়া স্বৈরাচারকেই সমর্থন করা।

আমরা আগেই বলেছি, নিছক অতীতের মাপকাঠিতে বর্তমানকে বিচার করা অনৈতিহাসিক। তিনশো বছরের বুর্জোয়া শিল্পায়নের অন্তর্নিহিত মুনাফার লালসা জীবন ও জগতে কী কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, আজকে শিল্প গড়ে ওঠার সামনে বাধাগুলি কী কী, চালু শিল্পগুলিই যেখানে রুগ্ন হয়ে পড়ছে সেখানে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি আদৌ সম্ভব কি না — এইসব পরিমাপকগুলির ভিত্তিতেই বর্তমানের 'শিল্পায়নের' জিগিরকে ব্যাখ্যা করতে হবে। অথচ এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলি এড়িয়ে অমর্ত্যবাবু অতীতের কিছু নজির তুলেছেন শুধু নয়, 'শিল্পায়ন' প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য বাস্তবে হয়েছে সিপিএমের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি।

একসময় পথঘাট, পরিকাঠামো নির্মাণ করা সহজ ছিল না। তাই প্রাকৃতিক পরিকাঠামো ব্যবহার করে, অর্থাৎ প্রধানত জলপথে যাতায়াতের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হুগলি নদীর দু'ধারে শহর ও শিল্প দুইই গড়ে উঠেছিল। শিল্পের কাঁচামালের, প্রধানত পাটের ও ধাতুর সহজলভ্যতা এবং জলপথে সুলভে পণ্য পরিবহনের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে হুগলি নদীর ধারে প্রধানত চটকল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলি গড়ে উঠেছিল। নদীর ধারের জমি কৃষিজমি কি না, শহরের কাছে কি না, সে প্রশ্ন সেদিন গুরুতর হয়ে দেখা দেয়নি। আবার চা-শিল্পের জন্য সে যুগেই দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে যেতে পুঁজিপতিদের দ্বিধা হয়নি। চা-বাগান এলাকায় রেলপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা তারাই তৈরি করে নিয়েছিল। অমর্ত্যবাবু সঠিকভাবেই বলেছেন — 'শিলিগুড়িতে যান' বলে হুকুম দিলেই শিল্পপতিরা সেখানে যাবে না। বাজার অর্থনীতির নিয়মেই তাঁরা শিল্পের জন্য জায়গা বাছবেন। এই কারণেই একদিন খনির কাছাকাছি এলাকা দেখে অখ্যাত অনুর্বর অঞ্চলে টাটা ইস্পাত কারখানা করেছিল। যা শেষ পর্যন্ত জামশেদপুর টাটানগর

শিল্পশহর হিসাবে গড়ে উঠেছে। এভাবেই রুক্ষ লাল মাটির অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল দুর্গাপুর শিল্পনগরী। ভিলাই, রৌরকেলা, বোকারো শিল্পের দৌলতেই শহরে পরিণত হয়েছে। খনির নৈকট্যের কারণে আসানসোল, বার্নপুর, কুলটিতে শিল্পশহর তৈরি হয়েছে। এমনকী নদীপথের সুবিধা দেখে ইংরেজরা বজবজে তেলের ডিপো তৈরি করার সময় কলকাতা বজবজ রেললাইন পেতেছিল। আজকে বিজ্ঞানের যা অগ্রগতি তাতে অনুর্বর অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকলে হাইওয়ে বানিয়ে নেওয়া, রেলপথ বসানো, টেলিযোগাযোগ করে নেওয়া মোটেই কঠিন নয়। অন্যদিকে দেশে খাদ্যের প্রয়োজন বেড়েছে, তুলনামূলকভাবে উর্বর কৃষিজমির পরিমাণ কমেছে, ফলে ভিন্ন কাজে কৃষিজমি ব্যবহার করার ফলে খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতির প্রসঙ্গ বিচারে আসা উচিত, যে প্রশ্নে অমর্ত্যবাবু ঢোকেননি।

অমর্ত্যবাবুকে আরও যে প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তা হল — হুগলি নদীর দুধারে শিল্পস্থাপনের যে নজির তিনি দেখিয়েছেন, সেই শিল্পগুলিই বন্ধ হয়ে হাজার হাজার একর জমি পড়ে আছে, বন্ধ কারখানার শেডগুলি পর্যন্ত পড়ে আছে। অথচ শহরের এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও এইসব জমিতে কিছু আবাসন হচ্ছে কিন্তু 'শিল্পায়ন' হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবে এটা অমর্ত্যবাবুর ভাবার কথা যে, বাজার অর্থনীতির কোন্ নিয়মে টাটা সিঙ্গুরে জমি চাইছে। আর কেনই বা সিপিএম টাটাকে জমি দেওয়ার জন্য সরকারি তহবিলের কোটি কোটি টাকা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে? এদিক থেকে ভাবলেই তিনি দেখতে পেতেন গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়াতেই উৎপাদনমুখী ক্ষেত্রে বিনিয়োগে ভাটা চলছে, শেয়ারফাটকা এবং রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় বিনিয়োগের জোয়ার। কারণ রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় এখন মুনাফা প্রচুর। ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গে এমনকী, সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের যৌথ উদ্যোগে রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা চলছে রম্‌রম্ করে। সেক্ষেত্রে সিঙ্গুরে টাটার ছোটগাড়ির ব্যবসার পরও উচ্চ মুনাফায় জমির ব্যবসা বা আবাসন ব্যবসারও রাস্তা খোলা থাকছে, এমনকী কর্পোরেট চাষের পথও খোলা থাকছে। এই সব কারণেই কি টাটারা সিঙ্গুরের উর্বর জমিতে শকুনির নজর দেয়নি? টাটার আবদার রক্ষা করতেই কি সিপিএম সিঙ্গুরে হাজার হাজার ক্ষুদ্র চাষী, বর্গাদার ও খেতমজুরকে অনাহারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে না?

অমর্ত্য সেন বলেছেন — বাজার অর্থনীতির অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, কিন্তু তা কর্মসংস্থান করে ও আয় বৃদ্ধি ঘটায়। এর ফলে সরকারি আয় বাড়ে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে ব্যয়বরাদ্দ করা যায়। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে,

সিপিএমও শিল্পায়নের জিগিরের পিছনে কর্মসংস্থানের দোহাই দিচ্ছে। অমর্ত্য সেন ব্রিটেনে থাকেন, পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের আধুনিক 'জবলেস গ্রোথ', অর্থাৎ 'কর্মসংস্থানহীন বিকাশের' কথা তিনি নিশ্চয়ই জানেন। যদি তিনি ২০০৫ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সিপিএমের অষ্টাদশ পার্টি কংগ্রেসের দলিল দেখতেন, তাহলেই এদের নগ্ন দ্বিচারিতা দেখতে পেতেন। কারণ সিপিএমই বলেছে বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক বিকাশ শুধু 'কর্মহীন' হচ্ছে তা নয়, তা 'কর্মচ্যুতি' ঘটাচ্ছে (পৃ, ৯)। অর্থাৎ নতুন কারখানায় যতটুকু কর্মসংস্থান হচ্ছে, ছাঁটাই হচ্ছে তার চেয়ে বেশি। একই কথা বলেছেন সিপিএমের প্রথম সারির নেতা ও বুদ্ধিজীবী প্রভাত পট্টনায়ক। তাঁর মতে, শিল্পায়ন আজ আর সম্ভব নয়। আজ যা হচ্ছে, তা হল কর্পোরেট শিল্পায়ন যাতে কর্মসংস্থান হচ্ছে না। (দ্রঃ ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২৬ মে ২০০৭ সংখ্যা)। সাম্প্রতিককালের সরকারি পরিসংখ্যানও তা-ই বলছে। এক্ষেত্রে অমর্ত্যবাবু — শুধু সিপিএম নয়, বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএমএফ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ওয়াশিংটন কনসেনসাসের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করেছেন।

অমর্ত্য সেন বলেছেন — সিপিএম নাকি জমির যা দাম দিচ্ছে তা বাজারছাড়া এবং অত্যন্ত বেশি। ভূভারতে কেউ চাষীকে নাকি এত দাম দিচ্ছে না। সরকারি বক্তব্য স্টাডি করলে অবশ্য এটাই পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, সরকার নিজেই ইতিমধ্যে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের নামে ৭৪০০০ টাকা একর দরে জমি কিনে সেই জমি ৪ থেকে ২৪ লক্ষ টাকা একর দরে বেচেছে। রাজারহাটে ৬০০০ টাকা কাঠা দরে জমি কিনে ৯৪ হাজার টাকায় বেচেছে। (দ্রঃ দেশ, ১৭ জুলাই '০৭) বারুইপুরে জমি অধিগ্রহণ করা হবে ২৬৭০ একর এর মধ্যে ১০০ একর জেলা সদরের জন্য রেখে বাকিটা অর্থাৎ ২৫৭০ একর জমি বেশি দামে বিক্রি করে রাজ্য সরকার লাভ করবে ৩২০ কোটি টাকা। (দ্র ঃ সংবাদ প্রতিদিন ৩১.১.০৫) খড়্গপুরেও চাষীদের অভিযোগ — অধিগৃহীত জমি বেচে লাভ করবে রাজ্য সরকার। নন্দীগ্রামের সংগ্রামী চাষী, যাঁরা নিজেদের জমি চাষ করেন বা চাষের উপর নির্ভরশীল, তাঁরা বলছেন — ''জমি আমাদের মা, এই জমির ওপর নির্ভর করে পুরুষানুক্রমে আমরা মানুষ হয়েছি, টাকা দিয়ে মায়ের দাম ঠিক করা যায় না কি?'' জমি বাস্তবে তাদের জীবিকার উপায়, নগদ টাকা কলসির জলের মতো, গড়িয়ে খেলেই ফুরিয়ে যাবে। বাস্তবে জমির মালিকদের মধ্যে যাঁরা অন্য চাকরিবাকরি বা ব্যবসাপাতি করেন তাঁরা যেভাবে বিষয়টা দেখছেন, জমিনির্ভর গরিব চাষী, খেতমজুর ভাগচাষীরা সেভাবে দেখছেন না। জমি গেলে তাদের জীবিকা চলে যাবে। খাটবার পর্যন্ত জায়গা থাকবে না। এদের কথা

অমর্ত্যবাবুর মনে হয়নি। সর্বশেষে বলা দরকার, এককালে ভারতকে শোষণ করে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে দূর থেকে তিনি ফতোয়া দিয়েছেন, শিল্প হলে সরকারের রাজস্ব বাড়বে, শিক্ষা স্বাস্থ্যে সরকারি ব্যয়ের বন্দোবস্ত হবে। বস্তুত কেতাবি তত্ত্বের চশমা খুলে মাটির পৃথিবীর দিকে তাকালেই তিনি দেখতে পেতেন — বর্তমানের তথাকথিত শিল্পায়নের শর্তই হল করছাড় দিতে হবে। সরকারি রাজস্ব ফাঁকির কথা ছেড়ে দিলেও শুধু এসইজেড এলাকাগুলিতেই এক লক্ষ কোটি টাকা করছাড়ের বন্দোবস্ত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বরাদ্দের কথা উঠলেই অর্থাভাবের দোহাই দেয় যে সিপিএম, তারা সিঙ্গুরে শুধু জমি বাবদ সরকারি তহবিল থেকে যে ১২০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে টাটাদের এটা ফাঁস হয়ে গিয়েছে। সিঙ্গুরে টাটার জমি পাহারা দিতে পুলিশের পিছনে শত শত কোটি টাকা খরচ করছে সরকার। সালিম, জিন্দাল, আম্বানিদের কোথায় কত দিচ্ছে তা আজও সরকার বলেনি।

অমর্ত্য সেন বলেছেন — কৃষকের সংখ্যা কমে গেলে কৃষকের সমৃদ্ধি ঘটে। কথাটা অর্ধসত্য, তাই তা মিথ্যার চেয়েও ভয়ানক। যদি কৃষির আধুনিকীকরণের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষকের সংখ্যা কমে এবং উদ্বৃত্ত কৃষক শিল্পে কাজ পায় তবেই কৃষকের সমৃদ্ধি ঘটে। জমির হারিয়ে খেতমজুর বা গ্রামীণ মজুরে পরিণত হলে, ধনীর বাড়ির দারোয়ান বা গৃহপরিচারিকা হলে, শহরের ধারে ঝুপড়িতে ফুটপাথে ঠাঁই নিয়ে ভিক্ষা করলে কৃষকের সমৃদ্ধি ঘটে না। আজকের সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ কর্মরত শ্রমিকদেরই ছাঁটাই করছে, জমিহারা কৃষকের সামনে রোজগারের পথ বন্ধ। এই নির্মম বাস্তবকে অমর্ত্য সেন দেখতে চাইছেন না। কারণ তাঁর লক্ষ্য সত্য সন্ধান নয়, তাঁর লক্ষ্য একচেটিয়া পুঁজি ও তার সেবাদাস সিপিএমের পক্ষে ওকালতি করা।

সাক্ষাৎকারে তিনি পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের বামপন্থী আন্দোলনের সমালোচনা করে বলেছেন, এর ফলে আশু কিছু অধিকার শ্রমিকরা পেলেও, আখেরে তাদের ক্ষতি হয়েছে। কারণ এর ফলেই কলকাতা থেকে পুঁজি নাকি চলে গিয়েছে। শ্রমিক আন্দোলনের ফলে পুঁজির রাজ্যত্যাগের বিষয়ে কোনও তথ্যপ্রমাণ তিনি দেননি। অথচ তাঁর জানার কথা '৬৭ যুক্তফ্রন্টে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর শ্রমমন্ত্রীত্বের কালে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ারের সময় পুঁজির দেশান্তরী হওয়ার বিশ্বব্যাপী মালিকী প্রচার যে মিথ্যা তা তৎকালীন কৃষিসচিব দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ল্যান্ড লেবার অ্যান্ড গভর্নেন্স' পুস্তকে তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণিত। রাজ্য সরকারের লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তথ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন

’৬৭ থেকে ’৬৯ সাল পর্যন্ত তিন বছরে ৪৪৬টি ক্লোজারের মধ্যে ঘেরাওয়ের জন্য ক্লোজার হয়েছে মাত্র ৪টি কারখানা। তিনি বলেছেন, এ সময় কর্মচ্যুতি ঘটেছে বাজারে মন্দার জন্য, জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের জন্য নয়। বর্তমানে শ্রমিক আন্দোলন না থাকা সত্ত্বেও ’৯৪ সালের হিসাবে রাজ্যে ৫৬,০০০ কলকারখানা কেন বন্ধ? কেন ধর্মঘট ও শ্রমিক আন্দোলনের জন্য মাত্র ২ শতাংশ কারখানা বন্ধ, কেন ৯৮ শতাংশ বন্ধ মালিকদের করা লকআউট ক্লোজারের ফলে? সে প্রশ্নও সুকৌশলে অমর্ত্যবাবু এড়িয়ে গিয়েছেন। এর দ্বারাও আন্দোলনবিমুখ সিপিএমের বর্তমানের হুমকি — ‘‘আন্দোলন হলেই মালিক কারখানা বন্ধ করে দেবে, অতএব মালিকী অত্যাচার মেনে নাও’’ — একেই সমর্থন করেছেন অমর্ত্য সেন। অর্থাৎ নিরপেক্ষতার ভান করার জন্য বামপন্থীদের মৃদু সমালোচনাটাও তিনি এমনভাবে করেছেন, যাতে মালিকশ্রেণী এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সিপিএম খুশি হবে।

সিঙ্গুরে কৃষিজমি দখলের পক্ষে ওকালতি করলেও অমর্ত্য সেন আশ্চর্যজনকভাবে নন্দীগ্রাম সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি। তিনি বলেছেন, সিঙ্গুরের ব্যাপারটা তিনি ‘স্টাডি’ করেছেন, কিন্তু নন্দীগ্রামের বিষয়টি ‘স্টাডি’ করেননি। সিঙ্গুরের ব্যাপারে কী ‘স্টাডি’ তিনি করেছেন? এই আন্দোলনের নেতৃত্ব, রাজনৈতিক দল বা জমি দিতে নারাজ চাষীদের সঙ্গে কি তিনি কথা বলেছেন? তা তো বলেননি। তাহলে বাকি যা থাকে, তাহল ভুল ও মিথ্যা তথ্যে ভরা সিপিএমের প্রচারপুস্তিকা বা সরকারি নথিপত্র পড়া। টাটার পক্ষ সমর্থনের জন্য এর চেয়ে ভাল ‘স্টাডি’ আর হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হল — নন্দীগ্রামের কথা যেখানে দেশের মানুষ শুধু নয়, গোটা দুনিয়া জেনে গিয়েছে, সেখানে অমর্ত্য সেন তা জানেন না — এটা কি সম্ভব? আসলে এক্ষেত্রে তিনি মতামত দেওয়ার দায়িত্ব সুকৌশলে এড়াতে চেয়েছেন। কারণ এই ঘটনায় সিপিএমকে সমর্থন করার জন্য কুযুক্তি খাড়া করারও কোন উপায় নেই। স্বদেশি আন্দোলনের যুগ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবী যে আপসহীন স্পষ্টবাদিতা, সাহস ও জনমুখী মানসিকতার ঐতিহ্য স্থাপন করেছেন, অমর্ত্য সেন সেই ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষা করেননি। ‘স্টাডি নেই’ এই অজুহাতে নন্দীগ্রাম সম্পর্কে কিছু না বলেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন — কেন, কী উদ্দেশ্যে, কাকে সমর্থনের জন্য তিনি মুখ খুলেছেন। কিন্তু গোটা রাজ্যে এবং রাজ্যের বাইরেও যে প্রবল বিরোধিতা ও ঘৃণার মুখে সিপিএম পড়েছে, নন্দীগ্রামে যে তীব্র গণপ্রতিরোধের সামনে পড়ে সিপিএম পিছু হঠে যেতে বাধ্য হয়েছে, তা থেকে সিপিএমকে তিনি রক্ষা করতে পারবেন কি?

(গণদাবী ১৭-২৩ আগস্ট, ২০০৭)

শিল্পায়ন হবে? শিল্পপণ্য কিনবে কারা?

গণদাবীর পাঠকরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, এ রাজ্যে সিপিএম বা অন্যান্য রাজ্যে কংগ্রেস-বিজেপি’র মতো দলগুলো ‘শিল্পায়ন’ ‘শিল্পায়ন’ বলে যে প্রচার তুলছে, ‘বেকারদের জন্য শিল্প চাই’ বলে যে স্লোগান দিচ্ছে, আমরা তাকে ছলনা বা ধাপ্পা বলেছি। তাছাড়া, সিপিএমের জায়গায় অন্য দল বসলে তারা শিল্পায়ন করতে পারবে বলে যেকথা তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দলগুলি বলে থাকে, আমরা সেকথাও বলিনি।

আমরা নানাভাবে বারবার একথাই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে দেশে চাষী-মজুর-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত জনগণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করার জন্য যে শিল্পায়নের প্রয়োজন, যেটা না হলে দেশের মানুষের খাওয়া-পরা-আশ্রয়ের সমস্যার সমাধান হতে পারে না, সেই শিল্পায়ন ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। এই উৎপাদন ব্যবস্থা আজ দেশের ৮০ শতাংশ সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে এমন ঘোরতর সঙ্কট তৈরি করেছে যে, সাধারণ মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় শিল্পপণ্যগুলি কিনবার মতো আর্থিক ক্ষমতা দেশের অধিকাংশ মানুষের নেই।

কেন দেশের অধিকাংশ মানুষের শিল্পপণ্য কেনার ক্ষমতা নেই

কেন এই অবস্থা দেশে সৃষ্টি হল? কারণ, এই উৎপাদন ব্যবস্থাটাকে বলা হয় পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে মুনাফা — ক্রমাগত বেশি বেশি মুনাফা, যাতে মালিকের পুঁজির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। এই মুনাফা শিল্পপতিরা বা পুঁজিপতিরা পকেটে পুরতে পারে কেবলমাত্র শ্রমিককে ক্রমাগত বেশি মাত্রায় শোষণ করে। এই শোষণ পুঁজিবাদে দু’রকমভাবে হয়। একটা হচ্ছে কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে — অর্থাৎ, একজন শ্রমিক যা মজুরি পায়, তাতে ৪ ঘণ্টার উৎপাদন করলেই সেই পরিমাণ মজুরি উঠে যায়, কিন্তু তাকে কাজ করিয়ে নেওয়া হয় ৮, ১০, ১২ ঘণ্টা। এই যে বাকি ৪-৬-৮ ঘণ্টার উৎপাদন, তার জন্য কোনও মজুরি শ্রমিক পায় না। এটা মালিকের মুনাফা হয়ে পকেটে যায়, পুঁজির বৃদ্ধি ঘটায়।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, আধুনিক যন্ত্রপাতি বসানো। এতে কাজের সময় বা ঘণ্টা একই থাকবে, কিন্তু আগে এই যন্ত্র ছাড়া শ্রমিক ১ ঘণ্টায় যা উৎপাদন করত, এখন যন্ত্র দিয়ে ১ ঘণ্টায় তার দ্বিগুণ উৎপাদন করে। অর্থাৎ, শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা যায় বেড়ে। এর দ্বারা হয়তো দেখা যাবে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে ২ ঘণ্টা কাজ করলেই শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরি উসুল হয়ে যায়। অথচ শ্রমিকের কাজের ঘণ্টা একই থাকে। ফলে শ্রমিকের একই কাজের ঘণ্টার মধ্যে মালিকের মুনাফা অনেক বেড়ে যায়। সামগ্রিকভাবে দেখলে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া উৎপাদন করতে কারখানায় যত শ্রমিক প্রয়োজন হয়, যন্ত্রপাতি দিয়ে উৎপাদন করালে তার চেয়ে অনেক কম শ্রমিক প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য পুঁজিপতিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাওয়ার আসল কারণ এটাই। সকলেই চাইছে, উৎপাদনের খরচ কমিয়ে লাভের অঙ্ক বাড়াতে। এটা কোনও একজন পুঁজিপতির ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয় নয়। আধুনিক প্রযুক্তি এসে গেলে, তা ব্যবহার করে শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে উৎপাদন ব্যয় কমাতে যে পুঁজিপতি ব্যর্থ হবে, তার উৎপাদিত পণ্যের বাজার অন্য পুঁজিপতি দখল করে নেবে। এটাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম।

এই নিয়মের পরিণামটা সমাজের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে? আধুনিক প্রযুক্তি এসে যাওয়ার ফলে মালিকরা আরও কম শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন করাতে চায়, শ্রমিকদের 'বাড়তি' ঘোষণা করে আরও ছাঁটাই করে দেয়, যেমন খুশি ছাঁটাই করতে পারার অধিকার দাবি করে, যেমনটা ভারতে করছে। ২/৪টা কলকারখানা যা হচ্ছে তাতে শ্রমিক লাগছে কম, ফলে বেকার তৈরি হচ্ছে ব্যাপক হারে। দেশের ২০০টি বড় বড় কোম্পানির আয়-ব্যয়ের উপর সমীক্ষার একটি রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, এক ইউনিট বাড়তি উৎপাদন করতে আগে যে পরিমাণ পুঁজির দরকার হত, এখন তার চেয়ে কম পুঁজি লাগছে। পুঁজিপতিদের ব্যাখ্যায়, এর দ্বারা পুঁজির দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রমাণ হয়। আসলে এর দ্বারা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাবৃদ্ধিই প্রমাণিত হয়। অথচ শ্রমিকদের মজুরিবাবদ মালিকের ব্যয় কীরকম হচ্ছে? সমীক্ষা বলছে ১ টাকা মূল্যের বাড়তি উৎপাদনের জন্য মালিকরা মজুরিবাবদ ব্যয় করছে ৯ পয়সা।

ফলে এই নিয়মের পরিণামে দেখা যাচ্ছে, বেকার সংখ্যা বাড়ার ফলে দেশে ক্রমাগত আর্থিক ক্ষমতাহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। অন্যদিকে যে শ্রমিকরা কেবল বেঁচে থাকার মতো মজুরি পাচ্ছে, তাদের পক্ষে শিল্পপণ্য কেনার চিন্তা স্বপ্নমাত্র। এই পরিস্থিতিতে শিল্পপণ্য কিনবে কারা? আর, খদ্দেরই যদি না থাকে,

তবে কাদের কাছে মাল বেচে মালিক মুনাফা করবে? মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ — প্রথমত, যারা মালিক পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে পড়ে, দ্বিতীয়ত, বড় বড় কোম্পানির বিশাল বেতনের চাকুরে অর্থাৎ উচ্চবিত্তবান বা ধনী, তৃতীয়ত যারা এই ব্যবস্থার মধ্যেও একটু ভাল মাইনের চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে, অথবা চুরি-দুর্নীতি-কালোবাজারি করে টাকা করেছে — তারাই হচ্ছে খদ্দের। এদের ভোগের জন্য যেসব পণ্য দরকার, সেটা দেশের মধ্যে উৎপাদন করে হোক, বা আমদানি করে হোক, মালিকরা ও ব্যবসায়ীরা যোগান দেবে। এর জন্য যে ২/৪টা শিল্প হবে, বা ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে, তাকে তো আর দেশের মানুষের স্বার্থে 'শিল্পায়ন' বলা যায় না, দেশের শ্রীবৃদ্ধিও বলা চলে না। ধনীদের বিলাসপণ্যের উৎপাদনই এখন দেশে বাড়ছে, যাকে অনেকে 'কর্পোরেট শিল্পায়ন' বলছেন — যেজন্য মোটরগাড়ির উৎপাদন দেশে বাড়ছে।

দেশের সম্পদবৃদ্ধি কোন্ খাতে এবং কার পকেটে

ভারতের পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই যে বৈশিষ্ট্য ও ছবিটা আমরা 'শিল্পায়ন' বিতর্ক প্রসঙ্গে তত্ত্বগতভাবে উপস্থিত করেছি, বাস্তব তথ্যও ক্রমাগত কীভাবে তাকে প্রমাণ করছে, সেটা জানা দরকার। মর্গান স্ট্যানলি হচ্ছে একটি বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম। এর কাজ হচ্ছে, বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় অর্থ লগ্নি করা। এই প্রতিষ্ঠানের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা গত ৯ জুলাই ইকনমিক টাইমস্ পত্রিকায় একটি নিবন্ধে কিছু তথ্য জানিয়েছেন, যেটা ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার হালহকিকত বুঝতে সাহায্য করে। দেখা যাচ্ছে, গত ৫ বছরে ভারতে জিডিপি বেড়েছে দ্রুত হারে। এই জিডিপি মানে — এক বছরে দেশে নানা ক্ষেত্রে যত উৎপাদন বা আয় হয়, টাকার অঙ্কে তার পরিমাণ। একথা শুনলেই কেউ বলতে পারেন, এই তো উৎপাদন বাড়ছে, তাহলে সঙ্কট কোথায়? আসলে সঙ্কট বুঝতে হলে দেখতে হবে, কোন্ ক্ষেত্রে কী উৎপাদন বাড়ছে, কোন্ ক্ষেত্রে বাড়তি আয় কত সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই বৃদ্ধির সুফল কাদের হাতে যাচ্ছে?

মর্গান স্ট্যানলির হিসাবে গত ৪ বছরে ভারতে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে ১ ট্রিলিয়ন ডলার (মার্কিন হিসাবে ১ এর পিঠে ১২টি শূন্য, বা ১ লক্ষ কোটি ডলার)। অঙ্কটা বিরাট, ভারতের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (অর্থমূল্যে) সমান। এখানে যেটা বিশেষভাবে দেখার, তা হচ্ছে, এই বিপুল সম্পদ কি শিল্প উৎপাদন, বা কৃষি উৎপাদন থেকে সৃষ্টি হল? না, তা নয়। এই সম্পদবৃদ্ধির মুখ্য তিনটি ক্ষেত্র হল: (১) শেয়ারবাজার, (২) জমি-বাড়ি ও (৩) সোনা। শেয়ারবাজারের মাধ্যমে সম্পদবৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে, অপেক্ষাকৃত কম দামে শেয়ার

কিনে বেশি দামে বিক্রি করে লাভ করা, যাকে সরল ভাষায় ফাটকা কারবার, বা জুয়া বলা যায়। এখানেও আবার এই বাড়তি সম্পদের ভাগীদার কারা? কাগজে-টিভিতে আজকাল শেয়ারবাজার সমীক্ষা নিয়ে এত প্রচার তোলা হয়, যাতে মনে হবে, দেশের সাধারণ মানুষও বুঝি লাখে লাখে শেয়ারবাজারে গিয়ে শেয়ার কেনাবেচা করে বাড়তি আয় করছে। এত প্রচারের পিছনকার মতলব অবশ্য মানুষকে শেয়ারবাজারে ফাটকা খেলতে প্রলুব্ধ করা, যাতে জুয়ার দ্বারা হলেও কিছু মানুষের হাতে বাড়তি অর্থ আসে, ক্রেতার সংখ্যা কিছু বাড়ে। যাই হোক, শেয়ারবাজারের পরিচালন সংস্থা সেবি-র হিসাবে দেশের মানুষের মাত্র ৪-৭ শতাংশের হাতে শেয়ার আছে। গত ৪ বছরে শেয়ার-হোল্ডারদের আয়বৃদ্ধির পরিমাণ মোট ৫৭০ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে ৩৫০ বিলিয়ন ডলারের (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি টাকা) মালিক হচ্ছে, যেসব কোম্পানি বাজারে শেয়ার ছাড়ে তারাই। অর্থাৎ, শেয়ারের বেশি অংশটা আছে কোম্পানিগুলোর হাতেই। তারাই নানা উপায়ে দাম কমিয়ে-বাড়িয়ে শেয়ার থেকে বাড়তি লাভ ঘরে তোলে। ফলে, শেয়ারবাজারে সম্পদ সৃষ্টি হওয়ার সাথে দেশের সাধারণ মানুষের আয়বৃদ্ধি হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। এখানেও লাভবান মুষ্টিমেয় একটি অংশই।

এরপর আছে জমি-বাড়ি বা রিয়েল এস্টেট। মর্গান স্ট্যানলির হিসাবে গত ৪ বছরে জমি-বাড়ির রিয়েল এস্টেট কারবারে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে ৩০০০ থেকে ৫০০০ কোটি টাকা। এত জমি-বাড়ি কারা কিনল? ওদেরই হিসাবে দেশের মাত্র ৪৭ শতাংশ মানুষ 'পাকা বাড়িতে' বাস করার সুযোগ পায়। এদের মধ্যেও আবার উপরের বিত্তবান অংশই বর্গফুটের হিসাবে বেশি স্থান দখল করে আছে। অর্থাৎ, জমি-বাড়ির ক্রেতাও অধিকাংশই সাধারণ মানুষ নন। এই জমি-বাড়ির রিয়েল এস্টেট ব্যবসা প্রসঙ্গে আমরা পরে আবার আলোচনায় যাব।

তৃতীয় হচ্ছে, সোনাদানায় গচ্ছিত সম্পদ। এর পরিমাণ ২০০৩ সালে ছিল ২০ হাজার কোটি টাকা, সেটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭ সালের মার্চে দাঁড়িয়েছে ৩৭ হাজার কোটি টাকা। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার হিসাবে ২০০২ সালে সোনা-গয়না সহ স্থায়ী ভোগ্যপণ্যের ৭১ শতাংশ ভোগ দখল করত দেশের ৩৫ শতাংশ মানুষ যারা সর্বোচ্চ ধনের মালিক। অর্থাৎ, এই বিপুল সোনা-গহনার মালিকও দেশের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী।

এই হচ্ছে দেশে সম্পদবৃদ্ধি ও তার ভাগাভাগির সামান্য নমুনা। এখন শ্রমিকদের মজুরির যেকথা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, তার ছবিটা কেমন। মর্গান স্ট্যানলির হিসাব মতোই ২০০১ সাল থেকে ভারতের জাতীয় আয়ে

মজুরির ভাগ ক্রমাগত কমছে। জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয়ের যোগফল দিয়ে। তাতে পুঁজিপতিদের মুনাফাও যেমন থাকে, তেমনি শ্রমিক- কর্মচারীদের মজুরি বাবদ আয়ও থাকে। দেখা যাচ্ছে, গত পাঁচ বছরে জাতীয় আয়ে বড় বড় কোম্পানি ও ব্যবসায়ী সংস্থাগুলির মুনাফার অনুপাত বেড়েছে। ২০০২ অর্থবর্ষে জাতীয় আয়ে মুনাফার অংশ ছিল ৩.৭ শতাংশ, ২০০৭ সালে সেটা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৯.১ শতাংশ। অন্যদিকে মজুরির অনুপাতের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, এই একই সময়ে জাতীয় আয়ে মজুরির অংশ কমে গিয়েছে — ২০০১ সালে এটা ছিল ৩১ শতাংশ, ২০০৭ সালে তা কমে হয়েছে ২৮.৭ শতাংশ। এই মজুরি বলতে কোন্ কোন্ অংশের শ্রমিক-কর্মচারীর আয় ধরা হয়েছে — তা জানানো হয়নি। লাখ টাকা মাস মাইনের কর্মচারী বা ম্যানেজারের সাথে যদি ২ হাজার/৫ হাজার টাকা মাস মাইনের মজুরি শ্রমিককে মিলিয়ে ধরা হয়ে থাকে, তবে তার মধ্যে ফাঁকি আছে। তেমন গড় হিসাবে দেশের অধিকাংশ শ্রমিক-কর্মচারীর করুণ অবস্থার আসল ছবি পাওয়াই যাবে না। এর সাথে যদি দেশের ৭০ শতাংশ মানুষ, যারা কৃষিকাজে যুক্ত তাদের অবস্থা দেখা যায়, তাহলে দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় শূন্যের কোঠায়।

সাধারণের বরাদ্দ কমছে খাদ্যে, বাড়ছে জ্বালানি-বিদ্যুৎ-পরিবহন ও চিকিৎসায়

এই প্রসঙ্গে আর একটি তথ্যও খুব প্রাসঙ্গিক হবে। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বাড়ছে বলে যখন খুব হৈ চৈ চলছে, তখন কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার ২০০৭ সালে প্রকাশ করা ন্যাশানাল অ্যাকাউন্টস স্ট্যাটিসটিকস্ থেকে দেখা গেল, জিডিপি বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের মানুষের পারিবারিক খরচের মধ্যে খাদ্যে খরচের ভাগ ক্রমাগত কমেছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে যেখানে পরিবারের বার্ষিক খরচের ৪৫.৩ শতাংশই ছিল শুধু খাদ্যের জন্য, সেটা ২০০৫-০৬ সালে কমে হয়েছে মোট খরচের মাত্র ৩৩.৫ শতাংশ। পরিবারের পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য খরচের পরিমাণও কমেছে। দেখা যাচ্ছে, খরচ বেড়েছে বাড়িভাড়া, জ্বালানি ও বিদ্যুতে। খরচ বেড়েছে পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে। সবচাইতে খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে চিকিৎসার ক্ষেত্রে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, জনগণের একটা বড় অংশই পরিবারের খাদ্যের জন্য খরচ কমাতে বাধ্য হচ্ছে অন্যান্য খরচ মেটাবার জন্য। যে কেউ স্বীকার করবেন যে, সাধারণ মানুষের রোজকার খাদ্যের তালিকা ও পরিমাণ কমানো ছাড়া ব্যয় কমানোর অন্য কোনও পথই নেই। এই অবস্থার শিল্পপণ্য কিনবে তারা কীসের জোরে? কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও দেশের জিডিপি

বা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন আগের তুলনায় বাড়বে। কারণ, মানুষ জ্বালানি, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, পরিবহন ইত্যাদি যে যে খাতে আগের থেকে বেশি খরচ করতে বাধ্য হচ্ছে, সেই সেই ক্ষেত্রে জাতীয় আয় বা উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটেছে — এটাই হিসাবে আসবে। গৃহস্থকে কেরোসিন, গ্যাস, বিদ্যুতের দাম আগের চেয়ে বেশি দিতে হচ্ছে; পরিবহন খরচ, হাসপাতাল-ওষুধের জন্য খরচ বিরাট বেড়েছে — পরিণামে জিডিপি'র হিসাবের প্রশ্নে ঐসব উৎপাদন ক্ষেত্রে আয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে বলে দেখানো হবে। জিডিপি বৃদ্ধির রহস্যটা এমনই।

এই যেখানে দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, সেখানে পুঁজিপতিরা সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পপণ্য উৎপাদনে পুঁজি বিনিয়োগ করবে কেন? এই অবস্থা থেকে বেরোবার জন্য সর্বপ্রথম দরকার, সাধারণ মানুষের আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। সেজন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতি সেটা পারে না। বরং মুনাফা বাড়াবার জন্য পুঁজিপতিরা ক্রমাগত শ্রমিক ছাঁটাই করছে, আধুনিক প্রযুক্তি এনে শ্রমিকের সংখ্যা যত কম করা যায় তার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। কৃষিজমি কেড়ে নিয়ে হাজার হাজার চাষীর জীবিকা কেড়ে নিচ্ছে, খুচরো ব্যবসা দখল করে কোটি কোটি খুচরো ব্যবসায়ীর রুটি-রুজি ধ্বংস করার পথে যাচ্ছে। এইসব পদক্ষেপের দ্বারা পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু সাথে সাথে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা আরও কমে গিয়ে বাজারের আরও সংকোচন ঘটছে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় আরও সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

উচ্চবিত্ত ও ধনীদের ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদনই বাড়ছে

দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাহীন অবস্থা বাজারে যে ক্রমাগত চাহিদার সমস্যা বাড়িয়ে চলেছে, তাতে এখন উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হচ্ছে উচ্চবিত্ত ও ধনীদের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনে। জমি-বাড়ির রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় পুঁজি যাচ্ছে, সেজন্য সিমেন্ট-লোহা-ইট-এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাস্তা-ব্রিজ তৈরি হওয়ার খবরে এমনকী বিদেশি পুঁজিও আসছে এদেশে। এসবকে কেন্দ্র করে যেসব যন্ত্রপাতি বা দ্রব্য প্রয়োজন, সেগুলির উৎপাদন কিছু বাড়তে পারে। এক্ষেত্রেও মনে রাখা দরকার, এই জমি-বাড়ির তৈরির ও তা নিয়ে ব্যবসার কাজে যে পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে সেটাও মূলত ঋণনির্ভর, এমনকী শেয়ারবাজারের ফাটকাতেও খাটছে ঋণের টাকা। প্রোমোটাররা বাড়ি তৈরির জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে। আবার ফ্ল্যাটের ক্রেতারাও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দাম মেটাচ্ছে। জমি-বাড়ির পরিকাঠামো তৈরির রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় এখন বিরাট বিরাট

কোম্পানি নেমে পড়ায় ঋণের বাজারও বেড়ে গেছে। এমনকী কিছু কিছু রিয়েল এস্টেটের কারবারি এজন্য বিদেশের বাজার থেকেও ঋণ করছে। এভাবে দেশের অর্থনীতিতে ঋণ করা টাকার পরিমাণ বিপুল হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চিন্তিত হয়ে পড়েছে। ধার করে ঘি খাওয়ায় আপত্তি নেই, যদি ধার শোধ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে। কিছুদিন আগে আমেরিকায় জমি-বাড়ির ব্যবসায় মন্দা যেভাবে শেয়ারবাজারে ধস নামিয়ে দিল, তা নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করার মতো ঘটনা। আমেরিকার নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষ ব্যাংক থেকে দেদার ঋণ নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছিল, দলিল মর্টগেজ রাখা ছিল ব্যাংক বা অন্যান্য ঋণদানকারী সংস্থার কাছে। চুক্তিমতো মাসে বা বছরে ঋণ সুদসহ শোধ করার কথা। কিন্তু সেদেশেও সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা এখন এতই খারাপ যে, ঋণ শোধ করতে তারা ব্যর্থ হচ্ছে। এর ফলে ঋণ দেওয়া কোম্পানিগুলোয় লালবাতি জ্বলে গেছে, শেয়ারবাজারে এইসব কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দাম প্রায় শূন্যে ঠেকেছে, ধস নেমেছে শেয়ারবাজারে, যার ধাক্কা ভারতের শেয়ারবাজারে পড়েছে। ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত ঋণের উপর ভিত্তি করে যে ক্রয়ক্ষমতা, তার উপর নির্ভরশীল হয়ে উৎপাদন চললে বা বৃদ্ধি পেলে, তাতে বাইরে যতই দোকান-বাজার ঝলমলে দেখাক, আসলে অর্থনীতিটা দাঁড়িয়ে থাকে বালির চরের উপর। ভারতের অর্থনীতিরও দশা অনেকটা সেরকমই। আমরা যে ঋণের কথা বলছি, সেটা কিন্তু সরকারের করা ঋণ নয়, এ হল খোলাবাজারের ব্যাংক ও নানা ঋণদানকারী সংস্থা থেকে ধার করা টাকা — যেটা কৃত্রিম বা ফাঁপা ক্রয়ক্ষমতার সৃষ্টি করছে। সদ্যই এর নমুনা দেখা গেল গাড়ি-বিক্রির বাজারে। অর্থনীতিতে এ ধরনের ঋণের পরিমাণ কমাতে রিজার্ভ ব্যাংকের পরোক্ষ নির্দেশে বিভিন্ন ব্যাংক ঋণের উপর দেয় সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তারপরই টাটা মোটরস্ জানায়, তাদের গাড়ি বিক্রির পরিমাণ ৫ শতাংশ কমে গিয়েছে। অর্থাৎ মোটর গাড়ির 'তেজি' বাজারটা দাঁড়িয়ে আছে ঋণের উপর। কোনও ব্যক্তি ধার করে ব্যয় মেটাতে গিয়ে শেষে ব্যর্থ হলে আত্মহত্যা করছে এমন সংবাদ এখন প্রায়শই দেখা যায়। চাষীরা তো দলে দলে আত্মহননের পথ নিচ্ছে। কোনও দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এ জিনিস ঘটে অত্যধিক ঋণনির্ভরতা থেকে। অর্থনীতির চাকা পাঁকে পড়ে যায়। কলকারখানা-ব্যবসায় লালবাতি জ্বলে। এজন্য রিজার্ভ ব্যাংক ঋণের উপর লাগাম টানার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু সে ব্যাপারেও সমস্যা। কারণ ঋণ দেওয়া কমিয়ে দিলে ঋণনির্ভর উৎপাদন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্ম মার খাবে, বাজারে চাহিদা আরও কমে যাবে। বাজার আরও কমবে, ফলে উৎপাদনে আরও সংকট

বৃদ্ধি পাবে। তাই দেখা গেল, একদিকে ব্যাংকগুলিকে দেশের রিজার্ভ ব্যাংক নির্দেশ দিল, প্রয়োজনে সুদের হার বাড়িয়ে বাজারে টাকা কমাও, ঋণ বেশি দিও না; অন্যদিকে দেশের অর্থমন্ত্রী দেশের ব্যাংকগুলির চেয়ারম্যানদের ডেকে বৈঠক করে বললেন, ঋণের উপর সুদ বাড়াবেন না, তাহলে ঋণগ্রহণ কমে যাবে, উৎপাদন মার খাবে। শুধু তাই নয়, কম সুদের হারের কল্যাণে যেসব শিল্পপতির নীট মুনাফার পরিমাণ বেড়েছে, ঋণের উপর সুদের হার বাড়ানো হলে তাদের মুনাফা কমে যাবে। শিল্পে লালবাতি জ্বলবে। এই হচ্ছে ভারতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির 'শ্যাম রাখি, না কুল রাখি' অবস্থা।

ভারতের পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই অবস্থায় যেখানে অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, সেখানে শিল্পের লাগাতার বিকাশ বা 'শিল্পায়ন' সম্ভব বলে যারা প্রচার করে, তারা মস্তবড় রাজনৈতিক ঠগ্‌বাজ ছাড়া কিছু নয়। এর দ্বারা সিপিএম-কংগ্রেস-তৃণমূলের মতো দলের নেতারা সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে আসলে পুঁজিবাদের সেবা করে। এদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে গদি ও নিজেদের পকেট পূরণ এবং এ দুটোই এই ব্যবস্থায় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা নিশ্চিত করতে পারে বলেই এসব নেতারা পুঁজির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

প্রকৃত মার্কসবাদীরা জনগণের কাছে সত্য গোপন করে না, বরং প্রকৃত সত্য তুলে ধরে জনগণকে শিক্ষিত করে প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণের রাস্তায় পা ফেলতে চায়। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা তথা প্রকৃত মার্কসবাদী দল এস ইউ সি আই-এর আদর্শকে পাথেয় করে গণদাবী চলে। তাই আমরা প্রকৃত সত্য জনগণের সামনে তুলে ধরে বলি, আজকের সংকটজর্জরিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ভেঙে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া সাধারণ মানুষের স্বার্থে শিল্পায়ন, এবং তার মধ্য দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব হতে পারে না। ফলে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামেই জনগণকে আগুয়ান হতে হবে।

(গণদাবী ১৪-২০ সেপ্টেম্বর, ২০০৭)

খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি : চাষী ও ক্রেতাস্বার্থে নয়

শিল্পস্থাপনের নামে লক্ষ লক্ষ একর উর্বর কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে যখন রাজ্যের কৃষক সহ সাধারণ মানুষ সর্বত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছে, তখন অত্যন্ত চুপিসাড়ে রাজ্য সরকার আর একটি মারাত্মক আক্রমণ রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের উপর নামিয়ে আনার পরিকল্পনা সেরে ফেলেছে। তাদেরই পরিকল্পনায় এ রাজ্যের খুচরো বাণিজ্যেও ঢুকে পড়ছে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক দেশি-বিদেশি বৃহৎ ব্যবসায়ীরা। সিপিএম সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বায়ন-উদারীকরণের নীতিকে এ রাজ্যেও কার্যকরী করতে খুচরো বাজারে দেশীয় একচেটিয়া ও বিদেশি মাল্টিন্যাশানালদের প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে। এর ফলাফল খুচরো ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের সাথে সাধারণ মানুষের উপর মারাত্মক আকারে দেখা দেবে।

২০০৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সাথে সিপিএম সরকারের চুক্তি অনুযায়ী ফল ও সবজির খুচরো ব্যবসায় প্রথম দফায় প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা পুঁজি নিয়ে নামছে রিলায়েন্স। শুধু রিলায়েন্সই নয়, দেশি-বিদেশি অন্যান্য অনেক কোম্পানিও কৃষিপণ্য ও ভোগ্যপণ্যের পাইকারি এবং খুচরো ব্যবসায় নেমে পড়েছে। জার্মান বহুজাতিক 'মেট্রো' গোষ্ঠীর স্বয়ংসম্পূর্ণ সরবরাহ কেন্দ্র 'মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি' চালু হতে চলেছে মহানগরীতে। এর জন্য রাজ্য সরকার তাদের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। আপাতত রাজ্যের কৃষক ও মৎস্যচাষীদের ফসল ও মাছ সংগ্রহ করে তারা পৌঁছে দেবে হোটেল ও হাসপাতালগুলিতে। জেলায় জেলায় তারাও কৃষিজাত দ্রব্য ও মাছের সংগ্রহ কেন্দ্র গড়ে তুলবে। এর জন্য তারা প্রতিটি রাজ্যে ৫টি অত্যাধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ গুদাম তৈরি করবে, যেখানে সংরক্ষণের জন্য থাকবে হিমঘর, থাকবে বণ্টনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এর প্রতিটি তৈরি করতে খরচ হবে ৮০ কোটি টাকা। এই ব্যবস্থা চালু করতে তারা কয়েক হাজার কৃষক এবং মৎস্যজীবীকে ট্রেনিংও দিয়েছে। আগামী দিনে এই বহুজাতিকটি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের দাবি, তাদের কেন্দ্র থেকে পণ্য কিনতে ৮০ হাজার সদস্য ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত হয়েছে। গোয়েঙ্কার আর পি জি গোষ্ঠীর ৮০০

বর্গফুটের ভোগ্যপণ্যের খুচরো কাউন্টার 'স্পেনসার এক্সপ্রেস স্টোর' সম্প্রতি চালু হয়েছে কলকাতায়। আগামী এক বছরে শহরে আরও ২০টি কেন্দ্র খুলবে তারা। আগামী তিন বছরে আদিত্য বিড়লা গোষ্ঠী খুচরো ব্যবসায় ৮-৯ হাজার কোটি টাকা লগ্নি করবে। সারা দেশে এক হাজার সুপার মার্কেট চালু করবে তারা, যার প্রতিটির আয়তন হবে প্রায় দশ হাজার বর্গফুট। সুনীল মিত্তালের ভারতী গোষ্ঠী ঘোষণা করেছে, ২০১৫ সালের মধ্যে খুচরো ব্যবসায় তাদের লগ্নির পরিমাণ ১১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। ভারতী গোষ্ঠীর সাথে যৌথ উদ্যোগে যুক্ত হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম রিটেল চেনার বহুজাতিক সংস্থা ওয়ালমার্ট। গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর স্পেনসার্স এক্সপ্রেস-এর জন্য খোঁজ চলছে বহুজাতিক কাউন্টারপার্ট বিদেশি পুঁজির। রিলায়েন্সের সাথে যোগ দিয়েছে ব্রিটিশ বহুজাতিক 'টেসকো' (TESCO) এবং ফরাসি বহুজাতিক ক্যারেফর (CARREFOR)।

স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে খুচরো ব্যবসায়ীদের মধ্যে। যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি নিয়ে এই সমস্ত দেশি-বিদেশি কোম্পানি খুচরো ব্যবসায় নামছে এবং কৃষক সহ নানা স্তরের উৎপাদকদের সাথে সরাসরি চেনে এই ব্যবসা গড়ে তুলতে চলেছে, তাতে স্বল্প পুঁজির মালিক খুচরো ব্যবসায়ীদের পক্ষে কোনওভাবেই এদের সাথে এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। পরিণামে রাজ্যের ৫০ লক্ষ কৃষিপণ্যের ব্যবসায়ী এবং প্রায় সমসংখ্যক অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের ব্যবসায়ী বেকার হয়ে পড়বে। রাজ্যের প্রায় ৫০০ চালকল, ৪০০ হিমঘর এবং গ্রাম ও শহরের প্রায় ৩৫০০ হাট-বাজার বন্ধ হয়ে যাবে। এই হাট-বাজারের সাথে যুক্ত মুটে, ভ্যানচালক, পরিবহন কর্মী সহ নানা জীবিকায় যুক্ত রয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ। ভোগ্যপণ্যের বাজারেও কয়েক লক্ষ ক্ষুদ্র উৎপাদকের সাথে সারা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ বড়-ছোট সাপ্লায়ার, এজেন্ট এবং প্রায় ৫০ লক্ষ দোকান, ছোট দোকান, মুদিখানা বন্ধ হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে প্রায় কয়েক কোটি মানুষ বেকার হয়ে পড়বে। দেশের অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ খুচরো ব্যবসার সাথে যুক্ত। সেই ব্যবস্থাটিকেই মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজির হাতে তুলে দেওয়ার মানেই হল, এই ব্যবসার সাথে যুক্ত অসংখ্য মানুষের জীবন-জীবিকা বিপন্ন করা। ইউরোপ, আমেরিকার অভিজ্ঞতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, কীভাবে বিপুল পুঁজির অধিকারী এই দানবদের দাপটে খুচরো ব্যবসায়ীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। এমনিতেই রাজ্যে কয়েক কোটি বেকার-অর্ধবেকার, কর্মচ্যুত শ্রমিক-কর্মচারী, জমিচ্যুত কৃষক চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছে। এর সাথে নতুন করে যুক্ত হবে আরও কয়েক কোটি বেকার।

রাজ্যের সিপিএম সরকারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী কলকাতা ও শহরতলিতে

২০০টি কৃষিপণ্যের খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র (fresh outlet) খুলতে চলেছে রিলায়েন্স গোষ্ঠী, যেগুলিতে কৃষকদের খেত-খামার থেকে টাটকা ফল-ফুল-সবজি-মাছ প্রভৃতি ঝাড়াই-বাছাই করে এনে সরাসরি ক্রেতাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। গ্রামীণ অঞ্চল থেকে এক বিরাট রিটেল চেইন তৈরি করবে এই গোষ্ঠী। কোম্পানি প্রতিটি জেলা শহরে ১০ একর জমির উপর একটি করে বিক্রয় কেন্দ্র খুলবে, রাজ্য ভিত্তিতে ১০০ একর জমির উপর তৈরি ৬টি ন্যাশানাল ডিস্ট্রিবিউশন-কাম-প্রসেসিং সেন্টার তৈরি করবে, যেখানে বহুমুখী হিমঘর এবং গুদামঘর থাকবে, আমদানি-রপ্তানি, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, গ্রেডিং এবং লেবেলিং-এর ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি ব্লক শহরে ১০ একর জমির উপর একটি করে মোট ৯০টি রুরাল বিজনেস হাব তৈরি হবে, যেখানে নিজস্ব খাদ্যশস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, ফল ও সবজির জন্য হিমঘর, মাটি পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরি, কৃষিবিকাশ কেন্দ্র, হেলথ কেয়ার ব্যবস্থা, প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বাজার-দর জানার জন্য আই টি সুবিধা, প্রযুক্তি সহায়ক ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্ত আয়োজন থাকবে। এর প্রতিটি একেকটি কেন্দ্রীয় ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারের সাথে যুক্ত থাকবে। এছাড়া রাজারহাট নিউটাউন এবং ডানকুনিতে এরা দুটি ফুড অ্যান্ড ভেজিটেবল টার্মিনাল মার্কেট তৈরি করবে।

রাজ্য সরকার দেদার ছাড় দিচ্ছে বৃহৎ পুঁজিপতিদের

রাজ্যের সিপিএম সরকার রিলায়েন্সের এই একচেটিয়া ব্যবসাকে পূর্ণ মদত দিতে চুক্তিতে সমস্ত রকম আইনি ও অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জমি কেনার ক্ষেত্রে জমির ঊর্ধ্বসীমা আইন শিথিল করেই রিলায়েন্সকে জমি দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই জমির জন্য কোম্পানিকে বাজারদর দিতে হলেও সরকার স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন চার্জ মকুব করে দিয়েছে। প্রথম পাঁচ বছর বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ ছাড় ঘোষণা করেছে। এছাড়া মার্কেট ফি, লাইসেন্স ফি লাগবে না, রাজ্যের মধ্যে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে কোনও টোল-ট্যাক্স লাগবে না, প্রক্রিয়াকরণের জন্য কোনও ফি লাগবে না। এই সমস্ত সুবিধা কুড়ি বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। সরকারি কোষাগারে অর্থাভাবের অজুহাতে যেখানে রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের উপর প্রতিদিন নিত্য-নতুন ট্যাক্স বসিয়ে চলেছে, স্কুল-কলেজে শিক্ষার ফি, হাসপাতালের চার্জ বাড়াচ্ছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের উপর ভ্যাটের নামে বাড়তি করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, সেখানে দেশের বৃহৎ পুঁজির মালিকদের এইভাবে যথেচ্ছ ছাড় দিতে সরকারের আটকাচ্ছে না। সরকারের অন্যান্য শরিক দলগুলির অভিযোগ, বড়

শরিক সিপিএম চুক্তির বিষয় সম্পর্কে এমনকী তাদেরও কিছুই জানায়নি। লক্ষণীয় হল, যে সিপিএম এতদিন খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের কেন্দ্রীয় নীতির বিরোধিতার কথা বলে আসছিল, তারাই এইভাবে চুপিসাড়ে অন্যান্য খুচরো পণ্যের সাথে কৃষিজাত পণ্যের খুচরো ব্যবসায়ও বৃহৎ পুঁজিকে মুনাফা করার জন্য ব্ল্যাঙ্ক চেক দিচ্ছে। তারা একদিকে রিলায়েন্স সহ বৃহৎ পুঁজিপতিদের লাইসেন্স দিচ্ছে, অপরদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলে চলেছেন, কৃষিপণ্যের খুচরো ব্যবসায় কোনও বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীকে লাইসেন্স দেওয়ার প্রশ্ন নেই। যেন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম পুঁজির মালিক রিলায়েন্সরা বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী নয়! একে চূড়ান্ত দ্বিচারিতা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যাবে! এমনকী তারা খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজিপতিদের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে আম্বানিদের দেওয়া যুক্তিগুলোই আওড়ে বলছে, 'এর দ্বারা রাজ্যের কৃষকদের সঙ্গে দেশি ও বিদেশি বাজারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হবে'। যেন ভোগ্যপণ্যের বিশাল খুচরো বাজারের যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইতিমধ্যেই এই বৃহৎ পুঁজির দখলে এসে গেছে, সেখানে ক্ষুদ্র উৎপাদকরা এই যোগাযোগের সুবিধা ভোগ করতে পারছেন! লোক ঠকাবার কত কৌশলই না তারা আয়ত্ত করেছে!

একই নীতির অঙ্গ হিসাবে সরকার কলকাতা শহরের ১৭টি পুরবাজারকে ভেঙে নতুন বিপণন ভবন নির্মাণের নামে বৃহৎ পুঁজির মালিকদের হাতে সেগুলো তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। পার্কসার্কাস বাজার নির্মাণের বরাত পেয়েছে রিলায়েন্স গোষ্ঠী। ৩০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই দায়িত্ব পেয়েছে তারা। বাজারে আধুনিক পরিকাঠামো তৈরির সাথে সাথে নিজেদের খুচরো ব্যবসার জন্যও দেড় লক্ষ বর্গফুট আয়তনের অত্যাধুনিক কাউন্টার তৈরি করবে তারা। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে অম্বুজা গোষ্ঠীকে। নিউমার্কেট তুলে দেওয়া হচ্ছে গোয়েঙ্কার হাতে। এ ছাড়া মানিকতলা বাজারটিও রিলায়েন্সের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্য।

ওয়ালমার্ট-গোয়েঙ্কা-রিলায়েন্স-ভারতী বা অন্যান্যদের এয়ার কন্ডিশনড এই কাউন্টারগুলিতে জামাকাপড়, সবজি, ফল-মূল, তৈরি খাবার, মুদি, স্টেশনারি, প্রসাধন দ্রব্য, জুতো, সোনা-রুপোর অলঙ্কার, ওষুধপত্র প্রভৃতি সবই বিক্রি হবে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ফলে সমাজের ওপরতলার মুষ্টিমেয় অংশের হাতে প্রচুর অর্থ আসছে, বাকি অংশ ছিবড়ে হয়ে দরিদ্রতম অংশে পরিণত হচ্ছে। এই মুষ্টিমেয় অংশই প্রাথমিকভাবে মল সহ এই খুচরো কাউন্টারগুলির ক্রেতা। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির মালিকরা এগুলিকে স্থানীয় সংস্কৃতির থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন

করে বিশ্বায়িত সংস্কৃতির নামে আসলে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিতেই গড়ে তুলছে। সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ, রুচি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাকের বৈচিত্র্য, রুচির বৈচিত্র্য বলে আলাদা কিছু থাকবে না; ক্রমাগত প্রচার, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এ সবকিছুই নিজেদের মতো করে গড়ে দেবে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। তথাকথিত এই মল-সংস্কৃতির দ্বারা মধ্যবিত্তের একটা অংশকে সমাজের বাকি অংশ, শ্রমিক, কৃষক, সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছে; তৈরি করা হচ্ছে শেকড়-বিচ্ছিন্ন একটি তথাকথিত সুখী অংশ হিসাবে— যারা চাল মানে বুঝবে সুদৃশ্য প্যাকেটে ভর্তি একটি পণ্য, টাকা দিলেই যা কিনতে পাওয়া যায়। কোথা থেকে তা আসে, কত ঘাম-রক্তের বিনিময়ে তা উৎপন্ন হয়, এর পিছনে কৃষকের কতো কান্না, কতো হাহাকার রয়েছে, শোষণ-অত্যাচারের কী ইতিহাস রয়েছে, তা থেকে যাবে তাদের চোখের আড়ালেই। শপিং মলের চোখধাঁধানো আলোর তলায় চাপা পড়ে যাবে এ সব কিছুই। সমাজের এই অংশটিই হবে তথাকথিত শিল্পায়নের সমর্থক; লক্ষ লক্ষ একর উর্বর কৃষিজমি থেকে হাজার হাজার কৃষকের উচ্ছেদ, প্রশাসনের নিপীড়ন, অত্যাচার, মৃত্যু, ধর্ষণ যাদের হৃদয়ে কোনও দাগই কাটবে না। যারা বলবে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

কর্মসংস্থানের বস্তাপচা স্লোগান

আম্বানি-গোয়েঙ্কাদের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে তাদের সাথে গলা মিলিয়ে অনেকেই বলছেন, বাজারে পণ্য সরবরাহের পুরাতন ব্যবস্থার বদলে নতুন যে ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, সেখানেও অসংখ্য মানুষের কাজ জুটবে। কিন্তু তাঁরা যে কথা গোপন করে যাচ্ছেন, তা হল, বৃহৎ পুঁজির মালিকদের দ্বারা পরিচালিত এই খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রগুলি কোনও ক্ষুদ্র বিক্রয়কেন্দ্র নয়, বা শুধু বিক্রয়কেন্দ্রও নয়— উৎপাদন থেকে শুরু করে ক্রেতার হাতে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, গ্রেডিং, লেবেলিং প্রভৃতি একটি বিরাট প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ, যা পরিচালিত হবে বৃহৎ পুঁজির দ্বারা সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে, আধুনিক প্রযুক্তির পূর্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। কৃষি বিপণনের ক্ষেত্রে রিলায়েন্স যে কালেকশন ও ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারগুলি গড়ে তুলছে তার প্রতিটি স্তরে এই ব্যবস্থাগুলি হবে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর, সেখানে কাজ হয়তো কিছু সংখ্যক লোক পাবে, কিন্তু সে সংখ্যা হবে বিপুল সংখ্যক কাজ হারানো মানুষের তুলনায় উন্নত প্রযুক্তি জানা নগণ্য কয়েকজনের মাত্র। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, একজন ওয়ালমার্ট কর্মী ৪০ জন খুচরো দোকানের কর্মীকে কর্মচ্যুত করবে। মুম্বই শহরের ২৭টি শপিং মলে পর্যবেক্ষণ করে সমীক্ষকদের ধারণা— যদি শপিং মল

১০০০টি হয়, তাহলে সরাসরি ৫০,০০০ লোক কাজ পাবেন, কিন্তু তার প্রভাবে ন্যূনতম ৫ লাখ লোক কাজ হারাবেন। অর্থাৎ নবগঠিত শপিং মলে একজন কাজ পেলে, শপিং মলের জন্য বন্ধ হওয়া দোকানগুলিতে ১০ জন কাজ হারাবেন।

তাছাড়া এই সমস্ত শপিং মল বা খুচরো বিপণীগুলিতে যাঁরা কাজ পাবেন, তাঁদেরও তা করতে হবে যথেষ্ট কম মাইনেতে। ইতিমধ্যেই এই ধরনের যে কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছে, সেখানকার অভিজ্ঞতা হল, ন্যূনতম মজুরিতে সেখানে কাজ করানো হচ্ছে, কিন্তু কাজের সময় এবং বোঝা দুই-ই অনেক বেশি। যে ওয়ালমার্ট বিশ্বের বৃহত্তম খুচরো বহুজাতিক, আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মচারী যে কোম্পানিতে কাজ করে, কর্মচারীদের সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? কোম্পানি কর্মচারীদের সবচেয়ে কম মাইনে দেয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমনকী তা দারিদ্র্যসীমারও নীচে; কর্মচারীদের বিমা খাতে নামমাত্র খরচ করে এবং মহিলাদের দেয় খুবই কম বেতন। কোম্পানি কর্মচারীদের ট্রেডইউনিয়ন কার্যকলাপও সহ্য করে না। ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশ, যারা এই খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রগুলিতে কর্মসংস্থান হবে মনে করে তার সমর্থনে কথা বলছেন, তাদেরও আজ দেশি-বিদেশি এই বহুজাতিকগুলির শোষণের চরিত্রটি বুঝে এর বিরোধিতায় এগিয়ে আসতে হবে।

মুম্বই-এর অভিজ্ঞতা

খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির প্রবেশের পরিণাম কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, সম্প্রতি বৃহত্তর মুম্বইয়ে পরিচালিত এক সমীক্ষায় তা ধরা পড়েছে (সূত্র ঃ ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২-৮ জুন ২০০৭ সংখ্যা)। মুম্বই শহরের লোয়ার প্যারেলে একটি শপিং মল গত চার বছর ধরে চলছে; মুলুন্দের মলগুলি তিন বছরের কাছাকাছি সময় ধরে চলছে। এ পর্যন্ত ২৭টি মল এই শহরে গড়ে উঠেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই খুচরো ব্যবসার উপর এই মলগুলির প্রতিক্রিয়া ভয়াবহরূপে পড়তে শুরু করেছে। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এই মলগুলির জন্য খুচরো ব্যবসায়ীদের বিক্রি গড়ে ৭১ শতাংশ কমে গিয়েছে। এর মধ্যে মুদি দোকানের বিক্রি কমেছে ৮৭ শতাংশ, শাকসব্জি ও ফলমূলের ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ, তৈরি খাবারে ৪৪ শতাংশ, পোশাকে ৮৬ শতাংশ, জুতোয় ৮৩ শতাংশ, ইলেক্ট্রনিক্স-এ ১০০ শতাংশ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে ১০০ শতাংশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৫৮ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ৭১ শতাংশ বিক্রি কমেছে। এক কিলোমিটার বিস্তৃত মল এলাকায় সমীক্ষা চালিয়ে এই তথ্য পাওয়া গেছে। সমীক্ষায় আরও দেখা যাচ্ছে, যাদের পুঁজি কম, বিভিন্ন ধরনের মালপত্র রাখতে পারেন না, ছোট

দোকান— বিক্রি কমে গিয়েছে তাঁদেরই বেশি। ছোট পুঁজির মালিকরাই যে বৃহৎ পুঁজির দ্বারা উৎখাত হবেন, সমীক্ষা সেটাই স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছে।

খুচরো ব্যবসাকে পিরামিডের মতো সাজালে এর একেবারে তলার দিকে যাঁদের অবস্থান, তাঁরা হকার। এই হকাররাই সবচেয়ে বেশি আক্রমণের সম্মুখীন। রাস্তায় তাঁরা অস্থায়ী দোকান পেতে হকারি করেন। পৃথিবীর সমস্ত শহরেই এমন হকারদের দেখা যায়। পুঁজিবাদী শোষণের পরিণামে সর্বস্ব হারিয়ে এভাবে যাঁরা ধার-দেনা করে সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করে কোনক্রমে জীবিকা নির্বাহ করছেন, প্রায়ই পৌর কর্তৃপক্ষ তাঁদের বলপূর্বক তুলে দিয়ে অনাহারের মুখে ঠেলে দেয়। মুম্বই শহরে ২.৫ লক্ষ হকার। সমীক্ষা দেখাচ্ছে, ৭২ শতাংশ হকারের বিক্রি এবং মুনাফা দুই-ই কমে গিয়েছে। শপিং মলের দ্বারা এরাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত। কলকাতা সহ রাজ্যের অন্যান্য শহরগুলিতেও লক্ষাধিক হকার স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ এ রাজ্যের হকারদের উপরও একইরকম আক্রমণ নামিয়ে আনতে চলেছে।

কৃষকরা নাকি ন্যায্য দাম পাবে

বৃহৎ পুঁজির উমেদারদের বক্তব্য, বর্তমানে কৃষিপণ্যের উৎপাদিত মূল্যের প্রায় ৭০ ভাগই ফড়ে, আড়তদার বা দালালদের পকেটে চলে যায়। বৃহৎ পুঁজির এই বিপণন প্রক্রিয়ায় মাঝের এই স্তরগুলি থাকবে না। ফলে কৃষকরা সরাসরি বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কাছে ফসল বিক্রি করতে পারবে এবং 'ন্যায্য' মূল্য পাবে। কথাটা শুনতে মিষ্টি হলেও বাস্তবে সত্যিই এই অর্থ কি কৃষকের পকেটে ঢুকবে, বা ক্রেতারা পণ্য সস্তা দামে পাবে? ভাবখানা এমন যেন, সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে বৃহৎ পুঁজির মালিকরা কৃষক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র উৎপাদকদের স্বার্থেই এই হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। সর্বগ্রাসী একচেটিয়া পুঁজি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলির চরিত্র সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান থাকলে কেউ এরকম ধারণা করতে পারে না। লস এঞ্জেলস টাইমস্ লিখছে (২৩ নভেম্বর, ২০০৩), ওয়ালমার্ট নিজেই সরবরাহকারীদের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়, যা তাদের পক্ষে আদৌ লাভজনক নয়, ফলে সরবরাহকারীরা খুবই দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে। আমাদের দেশেও রিলায়েন্স, বিড়লা, মিত্তাল, গোয়েঙ্কা, ওয়ালমার্ট, মেট্রোর মালিকরা অন্যরকম আচরণ করবে— এমন ভাবার কোনও কারণ ঘটেছে কি?

পুঁজির লক্ষ্যই হল সর্বোচ্চ মুনাফা। পুঁজির ধর্মই হচ্ছে ক্রমাগত লাভজনক বিনিয়োগের দ্বারা পুঁজির বৃদ্ধি ঘটানো। অথচ গোটা বিশ্বজুড়েই চলছে চরম বাজার সংকট। সেই সংকটের শিকার ভারতের অর্থনীতিও। এই সংকটের মূল

কথা, অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় শূন্য, বিরাট অংশের কোনও শিল্পপণ্য কেনার ক্ষমতাই নেই। ফলে, শিল্পক্ষেত্রে পুঁজি লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র পাচ্ছে না। অথচ দেশের গরিব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষকে শোষণ করে, দেশের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে পুঁজির পাহাড় জমিয়েছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণী, যাদের মধ্যে অনেকেই মাল্টিন্যাশানাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে এই অঢেল পুঁজির বিরাট অংশ উদ্বৃত্ত, তথা অলস হয়ে পড়েছে। এই উদ্বৃত্ত পুঁজিই আজ শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ না পেয়ে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ে এবং ভোগ্যপণ্যের খুচরো বাজারে বিনিয়োগ করে কোটি কোটি মানুষকে নিঃস্ব করে দিয়ে সর্বোচ্চ মুনাফা বজায় রাখতে চাইছে। রাষ্ট্রীয় এবং প্রশাসনিক সহায়তাকে কাজে লাগিয়ে বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন পুঁজিমালিকরা কৃষিপণ্যসহ অন্যান্য বাজারে একবার আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে তার আক্রমণ থেকে কৃষক বা অন্য যে কোনও উৎপাদক বা ক্রেতা কেউই রেহাই পাবে না। চালু ছোট দোকানগুলিকে গ্রাস করতে ক্রেতাদের হয়তো সাময়িক কিছু সুবিধা তারা দেবে। এয়ার কন্ডিশন্ড বিগবাজার, সুপার মার্কেট, শপিং মল প্রভৃতি ঝকঝকে দোকান এবং তার চকমকে বিজ্ঞাপনের হাতছানিতে ক্রেতারাও হয়তো এই বৃহৎ পুঁজির মালিকদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলবে। ফলে অচিরেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে বাধ্য হবে। আর তখনই সাধারণ মানুষ একেবারে একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের থাবার মধ্যে গিয়ে পড়বে। ভোগ্যপণ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার ক্ষমতাটুকুও সাধারণ মানুষের থাকবে না। যারা অনেকেই মনে করছিলেন, শিল্পের নামে উর্বর কৃষিজমি দখল করাটা শুধুমাত্র কৃষকদের উপর আক্রমণ, ফলে প্রতিরোধের বিষয়টাও তাদেরই নিজস্ব ব্যাপার; খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি দখল নিলে তাদের উপরও এই আক্রমণটা সরাসরি এসে পড়বে। এবং পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের কোনও আক্রমণই যে বিচ্ছিন্ন আক্রমণ নয়, তা যে পুঁজিবাদের এক সামগ্রিক পরিকল্পনারই অঙ্গ, তা বুঝতেও আর কোনও অসুবিধা থাকবে না।

লাভজনক দামের লোভ দেখিয়ে চাষীদের রিটেল-চেনে যুক্ত করার চেষ্টা

রিলায়েন্স সহ বৃহৎ পুঁজির মালিক অন্যান্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলির তৈরি খুচরো ব্যবসার চেনে চাষীরা যুক্ত হলে প্রথম হয়তো কিছুটা ভাল দাম পেতে পারে, কিন্তু ধীরে ধীরে কৃষক তার স্বাধীন জীবিকা হারিয়ে পুরোপুরি বৃহৎ পুঁজির মালিকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। তখন তারাই স্থির করে দেবে, কোন্

ফসল ফলাতে হবে, কোন্ কোন্ সার-কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে। দেশের উচ্চবিত্ত অংশের এবং বিদেশের বাজারে লাভজনক ফসলই কৃষকদের উৎপাদন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় কৃষকদের বেঁধে ফেলতে আগাম ঋণ-দাদন দিয়ে সার-বীজ-কীটনাশক সরবরাহ করবে এই কোম্পানিগুলি। ইতিমধ্যেই রিলায়েন্স সহ কোম্পানিগুলি আলু প্রভৃতি খাদ্যশস্যে ফরওয়ার্ড ট্রেডিং শুরু করে দিয়েছে। অর্থাৎ, কৃষি বা অন্যান্য পণ্যের উৎপাদকদের আগাম অর্থ দাদন দিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য নির্দিষ্ট দামে 'বুক' করে ফেলা হচ্ছে, যাতে তারা অন্য কোথাও পণ্য বিক্রি করতে না পারে। কোনও কারণে যদি উৎপাদিত ফসল পুঁজি মালিকদের বেঁধে দেওয়া মানে না পৌঁছায়, তবে তার ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে কৃষককেই বহন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় সমগ্র কৃষিপণ্যের বাজারটি বৃহৎ পুঁজির দখলে এসে যাবে। কৃষক যখন এইভাবে পুঁজি-মালিকদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, তখন 'ন্যায্য' মূল্যের ন্যায্যতাও মালিকরাই নির্ধারণ করবে। মালিকদের পায়ের তলায় আত্মসমর্পণ ছাড়া কৃষকের আর কোনও উপায় থাকবে না। কারণ তারাই তখন উৎপাদিত পণ্যের একমাত্র ক্রেতা এবং যাবতীয় পণ্যের একচেটিয়া বিক্রেতা; কৃষক সহ সমস্ত উৎপাদককেই তাদের কাছে পণ্য বিক্রি করতে হবে এবং ক্রেতাদেরও একমাত্র তাদের কাছ থেকেই জিনিস কিনতে হবে। অর্থাৎ সমগ্র কৃষিক্ষেত্র নিয়ে এক সার্বিক কর্পোরেট সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে তারা, আর নিঃস্ব, রিক্তে পরিণত হবে কৃষক সহ সমস্ত ক্ষুদ্র উৎপাদকরা।

পুঁজিবাদী উদার অর্থনীতির অনুসারী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সাধারণ কৃষকদের সমস্ত রকমের সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া এবং সার, কীটনাশক প্রভৃতির বাজারটি পুরোপুরি দেশি-বিদেশি মুনাফাখোর পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার ফলে কৃষি ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। এমনকী বহুক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয়টুকুও কৃষকরা তুলতে পারে না। এমন অবস্থায় একটু ভাল দামের আশায় কৃষকরা বৃহৎ পুঁজির চাহিদা মেনে বাধ্য হবে তথাকথিত অর্থকরী ফসলই চাষ করতে। এর দ্বারা ধীরে ধীরে দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমনিতেই শিল্পায়নের নামে লক্ষ লক্ষ একর কৃষি জমি দখল করার সময়েই খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কার কথা উঠছে। বাকি জমির একটা বিরাট অংশেও খাদ্যশস্য উৎপাদন না হলে সে আশঙ্কা আরও বাড়বে। তখন এটা প্রায় অনিবার্য যে, খাদ্যশস্য উৎপাদনে ঘাটতি মেটাতে এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলিই বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করবে এবং চড়াদামে বিক্রি করবে কৃষক সহ সাধারণ মানুষের কাছে। কৃষকরা বাধ্য হবে নিজেদের উৎপাদিত

ফসল কম দামে বিক্রি করে চড়াদামে খাদ্যশস্য কিনতে। দেশজুড়ে দারিদ্র, অনাহার আরও বাড়বে। তৃতীয় বিশ্বের যে সমস্ত দেশে এই প্রক্রিয়া চালু হয়েছে, সেখানেই প্রবল খাদ্য সংকট, এমনকী দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে।

ক্ষুদ্র উৎপাদকদের রক্ষা করতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য জরুরি

স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন সবর্ত্রই দেখা দিচ্ছে, তা হল, বৃহৎ পুঁজির থাবা থেকে কৃষক সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের রক্ষা করার উপায় কী? অভাবী বিক্রির হাত থেকেই বা কৃষকদের কীভাবে রক্ষা করা যাবে? এর উপায় হল বাজারের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা, মজুতদারদের ও অসাধু ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করা এবং সর্বোপরি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা।

এস ইউ সি আই দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, বিশেষ করে খাদ্যশস্যের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করা জরুরি প্রয়োজন। কেন রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চাই, সে বিষয়ে ৬০-এর দশকে এস ইউ সি আই বলেছিল, ''স্টেট ট্রেডিং-এর দাবি তোলার তাৎপর্য হইতেছে যে, জনগণকে খাওয়াইবার দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যে ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যকে বেআইনি ঘোষণা করিতে হইবে ... এবং তাহার স্থলে পাইকারি ও খুচরো ব্যবসা উভয়ক্ষেত্রেই পূর্ণাঙ্গ স্টেট ট্রেডিং চালু করিতে হইবে'' (গণদাবী ২১-১১-৬৪)। অর্থাৎ, সরকার সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে জিনিসপত্র ন্যায্যমূল্যে কিনে নিয়ে জনসাধারণকে তা ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করবে। এর ফলে উৎপাদকরা যেমন অভাবী বিক্রির হাত থেকে রক্ষা পাবে, ন্যায্য তথা লাভজনক দাম পাবে এবং ফড়ে-আড়তদারদের মাঝপথে মূল্য আত্মসাতের রাস্তা বন্ধ হবে, তেমনই প্রতিবছর ন্যায্যমূল্য না পেয়ে বিপুল পরিমাণ ফসল কৃষকদের নষ্ট করে দিতে হবে না।

সেদিন এস ইউ সি আইয়ের এই প্রস্তাবের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে, অথবা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কোনও কোনও মহল থেকে এই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে, সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত ব্যবসা— পাশাপাশি থাকলে ক্ষতি কী? এ প্রশ্নের উত্তরে এস ইউ সি আই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিল যে, ''সরকারি সংগ্রহ ব্যবস্থার পাশাপাশি খোলাবাজারে খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনার ব্যবস্থা থাকলে— ব্যবসায়ী-জোতদারদের দুষ্টচক্র তাদের অর্থবলে, এমনকী সরকারের আর্থিক সংস্থাগুলি থেকেই ঋণ সংগ্রহ করে তার সাহায্যে সরকারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে চাষীদের দাদন দেবে, অগ্রিম ক্রয় করে

রাখবে। এমনকী সরকারি সংগ্রহ মূল্যের চেয়েও বেশি দাম দিয়ে গরিব চাষীদের কাছ থেকে শস্য কিনে গুদামজাত করে নেবে। ফলে যেমন পণ্যমূল্য বাড়বে, তেমনি এই পণ্য ব্যবসায়ীরাই আবার গুদামজাত করে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করবে এবং গুদামজাত পণ্যকেই পরে বাজারে বেচবে চড়া দামে। আর এই প্রভাবশালী দুষ্টচক্রের সাথে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে না পারায় সরকারি ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। ফলে খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যক্তিগত ব্যবসাকে নিষিদ্ধ করে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করতে পারলেই একমাত্র এই প্রতাপশালী দুষ্টচক্রকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা যেতে পারে— অন্যথায় নয়''। (গণদাবী ৯-৯-৭৭)।

এস ইউ সি আইয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের সেদিন বিরুদ্ধতা করেছিল সিপিএম, সিপিআই ও তাদের সহযোগী দলগুলি। তাদের বক্তব্য ছিল, এর ফলে খুচরো ব্যবসায়ীরা বিপন্ন হয়ে পড়বে। কী অদ্ভুত! খুচরো ব্যবসায়ীরা বিপন্ন হবে— এই ধুয়ো তুলে যে সিপিএম সেদিন খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের বিরোধিতা করেছিল, সেই সিপিএম আজ শুধু খাদ্যশস্যের ব্যবসাই নয়, পুরো খুচরো ব্যবসাকেই একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে খুচরো ব্যবসায়ীদের উৎখাত করতে চাইছে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের জন্য খুচরো ব্যবসায়ীরা বিপন্ন হয়ে পড়বে— সিপিএম-সিপিআইয়ের এই বক্তব্যকে ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়ে এস ইউ সি আই বলেছিল, ''গ্রাম-শহরে যে অগণিত খুচরো ব্যবসায়ী ও ছোট ছোট মুদি খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত'' তাদেরকে ''সরকারি লাইসেন্স দিয়ে নিয়ন্ত্রিত দামে বিক্রি করার সুযোগ দিলে এই সমস্ত ছোট ব্যবসায়ীদের জীবিকা নির্বাহের সমস্যাও বহুলাংশে মিটবে'' (গণদাবী ২১-৯-৬৭)। অর্থাৎ এস ইউ সি আই খুচরো ব্যবসায়ীদের সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে তাদের সুরক্ষার পথ দেখিয়েছিল। কিন্তু সিপিএম ও তার সহযোগীরা বৃহৎ ব্যবসাদার ও পুঁজিপতিদের স্বার্থে একথার অর্থ বুঝতে চায়নি।

প্রথম দিকে অবিভক্ত সিপিআই এবং আরএসপি সহ অন্যান্য বামপন্থী দল এস ইউ সি আই-এর এই বাস্তবোচিত ও বিজ্ঞানসম্মত দাবির তীব্র বিরুদ্ধতা করলেও পরবর্তীকালে আরএসপি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বক্তব্য মেনে নেয়। সিপিআই-সিপিএম জনমতের চাপে অন্তত পাইকারি ব্যবসার স্তরে আংশিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কথা বলতে থাকে। কিন্তু তারা খুচরো ব্যবসা সহ পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের দাবি বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে মানতে পারেনি। এস ইউ সি আইয়ের

বক্তব্য ছিল, শুধু পাইকারি ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কায়েম করলে পাইকারি ব্যবসাদাররাই বেনাম জমির মতো বিভিন্ন নামে খুচরো ব্যবসায়ী সেজে গোটা খাদ্যব্যবসাকে বাস্তবে নিয়ন্ত্রণ করবে। ফলে, এর দ্বারা বিশেষ পরিবর্তন হবে না। যাই হোক, ১৯৬৫ সালে যখন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি, তেমন একটা সময়েও আন্দোলনের চাপে পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন খাদ্যদ্রব্যের পাইকারি ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করেছিলেন। তীব্র জনমতের চাপে সেইসময় সিপিএমও পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য না হলেও পাইকারি ব্যবসা অধিগ্রহণের যে দাবি কেন্দ্রের কাছে জানাতে বাধ্য হয়েছিল, দেখা গেল, ক্ষমতায় আসার পর সেই সিপিএম নিজেরাই সেই দাবি বর্জন করল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বর্তমান বিশ্বায়নের নীতি অনুযায়ী সর্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্যের বেসকারীকরণের নীতি, যা মেনেই সিপিএম খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজিকে ডাকছে।

সিপিএমের দ্বিচারিতা

খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সারা দেশজুড়েই খুচরো ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ লক্ষ্য করে সিপিএম নেতারা বলছেন, কোনও গোষ্ঠী এই ব্যবসায় নামতে চাইলে তাদের লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক হোক। যেন এর দ্বারা খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরাট বিরোধিতা করা হল, যেন লাইসেন্স নেওয়াটা এইসব বৃহৎ পুঁজির মালিকদের কাছে খুব কঠিন ব্যাপার, যেন লাইসেন্স নিলেই সব 'শুদ্ধ' হয়ে গেল এবং তার ফলে বৃহৎ পুঁজির শোষণের চরিত্র আর থাকবে না; যেন দেশে দেশে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি যে নির্মম শোষণ চালাচ্ছে, তাদের লাইসেন্স নেই! আসলে এসবই বিক্ষুব্ধ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে সিপিএম নেতাদের কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া কিছু নয়। বিশ্বায়ন-উদারীকরণের নীতিকেই সিপিএম এ রাজ্যের সরকার পরিচালনার মধ্য দিয়ে কার্যকরী করছে। সে নিয়মেই খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি ঢুকছে। স্বাভাবিকভাবেই সিপিএমও এর বিরোধী নয়। কিন্তু রাজ্যে প্রবল জনপ্রতিবাদ দেখে তাদেরও বৃহৎ পুঁজির বিরোধিতার ভান করতে হচ্ছে। তাই যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে, তারা বলছেন, বৃহৎ ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক হোক, বেঁধে দেওয়া হোক একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বড় মাপের খুচরো দোকানের সংখ্যাও। এর কোনওটিতেই কি বৃহৎ পুঁজির মালিকদের কোনও আপত্তি রয়েছে? এর দ্বারা কি তাদের শোষণ-আগ্রাসন রোখা যাবে? পাশাপাশি, ছোট দোকানদার এবং কৃষকদের প্রতি তাদের দরদ বোঝাতে সিপিএম দাবি তুলেছে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবিকা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং

বৃহৎ সংস্থাগুলি যাতে চাষীদের ঠকাতে না পারে সে দিকেও নজর দিতে হবে। কবে হয়তো তারা বিড়ালকে মাছ না খাওয়ারও অনুরোধ করবে। বাস্তবে তাঁরা খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজিকে মেনেই নিয়েছেন। প্রকাশ কারাত বলেছেন, 'সারা দেশে যে নীতি থাকবে, পশ্চিমবঙ্গ বা কেরলকেও সেই নীতি মেনে চলতে হবে'। কেন? মেনে চলতে হবে— এ দাসখত কি কোথাও তাঁরা দিয়ে রেখেছেন? প্রথমত, এই নীতি যদি সত্যিই কয়েক কোটি মানুষের পক্ষে মারাত্মক হয়, তবে তাঁরা নীতি বদলানোর লড়াইয়ে নামছেন না কেন? কেন্দ্রীয় সরকারে তাঁরা তো এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, তাঁরা এমনও বলেন যে, ইচ্ছা করলে তাঁরা এ সরকার রাখতে পারেন, বা ফেলে দিতে পারেন; তবে জনবিরোধী তথা বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী এই নীতি রুখতে তাঁরা কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন না কেন? কেন নিজেরাই গোপনে বৃহৎ পুঁজির মালিকদের সাথে চুক্তি করছেন? দ্বিতীয়ত, সদিচ্ছা থাকলে চলতি আইনেই বহু কিছু করা সম্ভব। তাঁরা সত্যিই চাইলে এই আইনেও অনেক কিছু করা যেত। আসলে রাজ্যে ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং কেন্দ্রে ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার গ্যারান্টি হিসাবেই তাঁরা দেশি-বিদেশি পুঁজির কাছে অলিখিত দাসখত দিয়ে বসে আছেন। তাই খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে সিপিএম যা-ই বলুক না কেন, মৌখিক হম্বিতম্বির বেশি তা এগোবে না।

এই প্রশ্নে কংগ্রেস, বিজেপি সহ অন্যান্য শাসকদলের ভূমিকা কী? উদারনীতির সমর্থক প্রায় প্রতিটি শাসকদলই দেশের কয়েক কোটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে বৃহৎ পুঁজির থাবার মধ্যে ঠেলে দিয়ে নীরব দর্শক হয়ে রয়েছে। কংগ্রেস, বিজেপি প্রভৃতি দলগুলি ক্ষমতাসীন রাজ্যগুলিতে এই নীতি কার্যকরী করছে, অর্থাৎ খুচরো ব্যবসাতে দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির ঢোকার জন্য আইনি এবং প্রশাসনিক সমস্ত ব্যবস্থাই করে দিচ্ছে। আবার যেখানে তারা বিরোধী দল, সেখানে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে ভোটের বাক্সে কাজে লাগাতে এমন ভাব দেখাচ্ছে, যেন এই নীতির তারা কত বিরোধী! এই দলগুলি সম্পর্কে সাধারণ মানুষ এবং ভুক্তভোগী ক্ষুদ্রব্যবসায়ীদের সাবধান থাকতে হবে। কারণ, এম এল এ, এম পি-র জোরে এই দলগুলি আন্দোলনের সামনে এসে গেলে, সেই আন্দোলন বিপথগামী হতে বাধ্য।

তীব্র আন্দোলনই একমাত্র পথ

ফলে সত্যিই এ রাজ্যের কয়েক লক্ষ এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কয়েক কোটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে যদি বৃহৎ পুঁজির হাত থেকে রক্ষা পেতে হয় এবং বাজারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ এবং তার ফল হিসাবে মারাত্মক মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে দেশের

সাধারণ মানুষকে রক্ষা পেতে হয়, তবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। একথা অনস্বীকার্য যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে জনগণকে শেষপর্যন্ত রক্ষা করা, বা বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসন থেকে ক্ষুদ্র পুঁজিকে রক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মূল্যবৃদ্ধির উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায় না, বা ক্ষুদ্র পুঁজিকে রক্ষা করার জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায় না— একথা ঠিক নয়। তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলেই সরকারকে একাজে বাধ্য করতে হবে। বিভিন্ন রঙের সমস্ত সরকারি দলই আজ দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজিপতিদের পক্ষে দাঁড়িয়ে তাদের স্বার্থ দেখছে। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষকেই সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে।

খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে, বিপন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা রিলায়েন্সের পাঁচটি ফুড আউটলেটের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। উত্তেজিত জনতা সেখানে ভাঙচুরও চালিয়েছে। ধানবাদেও রিলায়েন্সের নতুন কাউন্টার খোলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে কোম্পানির নতুন কাউন্টারে বিক্ষোভের জেরে গোটা রাজ্যেই তাদের সমস্ত দোকান বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে রিলায়েন্স। উত্তরপ্রদেশেও সরকার বন্ধ করে দিয়েছে খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ। এ রাজ্যেও প্রবল জনবিক্ষোভে সাময়িকভাবে হলেও কাউন্টারগুলি বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে রিলায়েন্স; সর্বত্রই সংগঠিত হচ্ছেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা, চলছে আন্দোলনের প্রস্তুতি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং বৃহৎ পুঁজির মধ্যেকার যে আঁতাত আজ নগ্ন হয়ে থাবা বাড়িয়েছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজিকে ঠেকাতে হলে কী করতে হবে, নন্দীগ্রামের বীর কৃষক-খেতমজুর-বর্গাদাররা তা দেখিয়ে দিয়েছেন। তাদের পথ অনুসরণ করেই নিম্নস্তর পর্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সাথে সাধারণ ক্রেতা তথা ছাত্র-যুবক-মহিলা, গ্রামীণ কৃষক-খেতমজুর, শহরের শ্রমিক-মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের জড়িত করে আন্দোলনের হাতিয়ার সংগ্রামী কমিটি গড়ে তুলতে হবে; এখনই এর মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং এক দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। এস ইউ সি আই দল জনস্বার্থে গড়ে ওঠা অন্যান্য আন্দোলনগুলির মতোই এই আন্দোলনকেও সমস্ত দিক থেকে সহযোগিতা করে যাবে।

(গণদাবী ১-৭ জুন, ৭-১৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৭)

প্রকাশকের কথা

আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর বাংলা মুখপত্র ‘গণদাবী’তে প্রকাশিত সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর তিনটি নিবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হল।

আশা করি, গণআন্দোলনের জরুরি প্রয়োজন বুঝতে এই রচনাগুলি সাহায্য করবে।

১লা অক্টোবর, ২০০৭ **মানিক মুখার্জী**

এস ইউ সি আই অফিস

৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩